তৃতীয় অধ্যায়
উপন্যাসে বর্ণিত সমাজ ধারায় প্রতিকূল স্রোত

''জগদীশ গুপ্তের অভিজ্ঞতায় ছিল বিংশ শতকের বাঙালি বিত্তহীন সমাজ। দারিদ্র্য, অভাব অনটন তিনি খুব কাছ থেকেই দেখেছেন। আর দেখেছেন দরিদ্র মানুষের মনের গড়ন এবং তিনি ভালো করেই জানতেন যে, গ্রামীণ সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ—যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায়, তাদের চিন্তার সিংহভাগ জুড়ে থাকে নষ্টামি, ইতরতা, বিকার, বীভৎসতা এবং পরশ্রীকাতরতা দুষ্টু প্রবৃত্তি। আর সেই মানুষগুলিই জগদীশ গুপ্তের কথাসাহিত্যের মানুষ।''[১]

বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র থেকে স'রে এসেছিলেন জগদীশ গুপ্ত। তিনি পূর্বসূরীদের তথাকথিত সমাজ ভাবনায় একটা নতুন ধারা বইয়ে দিয়েছিলেন। আসলে সমাজ হল একটি বিমূর্ত ধারণা। স্পর্শেন্দ্রিয় বা দর্শনেন্দ্রিয়ের গণ্ডীর ভেতর তাকে পাওয়া যায় না। কেননা এই সমাজের কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যিক অবয়ব নেই। সেদিক থেকে সমাজ একটি অনুভূতির বিষয়। সমাজবদ্ধ মানুষ নিজেদের প্রয়োজনেই একদিন এই সমাজ গড়েছিল। ইংরেজী 'Society' র বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে সমাজ কথাটি প্রচলিত। ল্যাটিন শব্দ 'Socius' থেকে ইংরেজি 'Society' শব্দটির উৎপত্তি। 'Socius' কথার অর্থ হল 'সাহচর্য' বা 'সঙ্গীত্ব। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে সমাজ হল—সম-অচ্ + ঘঞ্ যোগে সমাজ। বর্ণে বর্ণে মিলনে যেমন সন্ধি হয় তেমনি মানুষে মানুষে একত্রে গমন, একত্রে বসবাসের ফলে গড়ে ওঠে সমাজ। মানুষ হল এই সমাজবদ্ধ জীব। আবির্ভাবের সেই আদিম অবস্থা থেকেই মানুষ হল যূথবদ্ধ। সমাজবদ্ধতার মূল ভিত্তি হল এই যূপবদ্ধতা। ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন রকম কাজকর্মের স্বার্থে এবং আশা আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির প্রয়োজনে মানুষ পারস্পরিক সহযোগিতার উপর নির্ভর করে থাকে। পারস্পরিক এই নির্ভরশীলতার প্রয়োজনীয়তা থেকেই সমাজবদ্ধ জীবনের সৃষ্টি হয়। তবে মনুষ্যেতর প্রাণীর তুলনায় মানুষের সামাজিক সম্পর্ক হয় অধিকতর জটিল প্রকৃতির। সাদৃশ্য ও সমতার ভিত্তিতে গোষ্ঠীবদ্ধতা এবং বৈসাদৃশ্য বা বিভিন্নতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পারস্পরিক স্বেচ্ছা সম্পর্কের মাধ্যমেই মানুষ সমাজের বুনিয়াদ গড়ে তোলে। এই সামাজিক সম্পর্ক ক্রমশ বিচিত্র ও জটিল আকার ধারণ করে। এই মানুষের মধ্যে আবার বেশীরভাগ মানুষ জন্মগ্রহণ করে, খেয়ে পড়ে বেড়ে ওঠে, আবার বংশবিস্তার করে একদিন

ম'রে যায়। কিছু মানুষ এদের থেকে কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। এরা সমাজে বাস করেও নিজের বৃত্তের সঙ্গে সমাজবৃত্তের একটা সংঘাত অনুভব করে নিয়ত। ফলে সেইসব একক মানুষের জীবন হয়ে ওঠে মূল সমাজের গণ্ডীর মধ্যে আবার স্বতন্ত্র একটা গণ্ডীর বেড়াজালে আবদ্ধ। জীবন হয়ে ওঠে—মূল সমাজের গণ্ডীর মধ্যে আবার স্বতন্ত্র একটা গণ্ডীর বেড়াজালে আবদ্ধ। জীবনানন্দ দাশ এইসব মানুষের সম্পর্কে স্পষ্টতই লিখেছেন—

''জন্মিয়াছে যারা এই পৃথিবীতে
সন্তানের মতো হয়ে—
সন্তানের জন্ম দিতে দিতে
যাহাদের কেটে গেছে অনেক সময়,
কিম্বা আজ সন্তানের জন্ম দিতে হয়
যাহাদের ; .....
— তবু কেন এমন একাকী?
তবু আমি এমন একাকী।''[২]

এইভাবে অনায়াসেই মেরুকরণ হয়ে যায়। পরিবর্তিত সমাজ ভাবনার নিরীখেই সাহিত্যে নিয়ত পরিবর্তনের সুর শোনা যায়। সচেতন শিল্পী -সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে তাঁর সমকালের জীবনের সুরটি অনায়াসেই ধরতে পারেন। বাংলা সাহিত্যে সমকালীন জীবনের এই মেঠো সুরটি প্রথম পাওয়া যায় মধ্যযুগের সূচনায় বড়ুচণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে। তারপর মঙ্গলকাব্যের, বিশেষ করে মনসা ও চণ্ডীমঙ্গলের দৈবী পরিমণ্ডলের ভেতরেও এই সুরের অনুরণন আমরা পেয়ে যাই। অভয়ামঙ্গলের কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী তো সেই কালে লিখেও ঔপন্যাসিকের মর্যাদা আদায় করে নিয়েছেন। সময়ের বেগে এই ধারাও বেগবতী হয়েছে। ভারতচন্দ্রে এসে একটা স্বতন্ত্র বেগও অনুভূত হয়। এরপর বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসে নিয়ে এসেছিলেন নিজস্ব ঘরানা। বঙ্কিমচন্দ্র হয়ে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসে বাংলাদেশের যে জীবন উঠে এসেছে, তাতে বিচ্ছিন্নভাবে থাকলেও গ্রামীণ জীবন প্রায় অনুপস্থিত। যেটুকুও রয়েছে তার বেশীরভাগটাই রোমান্টিক কল্পনা প্রসূত। কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের ছোটগল্পগুলিতে বাংলাদেশের গ্রাম জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। এমনকি রবীন্দ্র পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে, বিশেষ করে সমাজ সমস্যা মূলক উপন্যাসগুলিতে গ্রাম সমাজ উঠে

এসেছে—তাতেও রয়েছে সেই আদর্শায়িত রূপ। তবে যা কিছু গ্রামীণ জীবন ধারা তার প্রথম পরিচয় আমরা শরৎ উপন্যাসেই পাই। তিনিই প্রথম বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের আভিজাত্যপূর্ণ বাঙালী জীবন ছেড়ে অনাভিজাত্যের স্তরে নেমে এসেছিলেন। এ কথার সমর্থন রয়েছে ড. সরোজমোহন মিত্রের অভিমতে—''শরৎ সাহিত্যের আলোকে সমাজকে অতি নীচু স্তরে এনে পৌঁছে দিয়েছে। ফলে সাহিত্যের বিষয়বস্তু এবং গঠন কৌশলের রূপান্তর দেখা দিল। শরৎচন্দ্রের গল্পের শেষে পাঠক চিত্তে নিছক সুখ বা দুঃখানুভূতি দেখা দেয় না, এক তীব্র বিক্ষোভ জাগে। সমাজ পরিবর্তনের এক স্পৃহা জাগিয়ে তোলে। এই লক্ষ্য নিয়েই গল্প রচনা করেছেন বলে আঙ্গিকগত সীমাবদ্ধতা থাকলেও সামাজিক এবং উদ্দেশ্যগত সিদ্ধি লাভ ঘটেছে।''[৩] উত্তর-শরৎ বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে প্রথম যার রচনায় বাংলাদেশের গ্রাম জীবন একেবারে আঁকাড়া বাস্তব নিয়ে উঠে এসেছে তিনি নিঃসন্দেহে জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭)। পূর্ব প্রচলিত সমস্ত ভাবনাকে পাল্টে দিয়ে জগদীশ গুপ্ত তাঁর উপন্যাস সাহিত্যে গ্রাম বাংলার মানুষকে দেখেছিলেন একেবারে জান্তব বাস্তবতার দৃষ্টিতে। ফলে তাঁর দেখা গ্রামীণ জীবন ছিল একেবারে রক্ত মানুষের জীবন্ত চরিত্র। এই জীবনের দুটি সুস্পষ্ট রূপরেখা লেখক অংকন করেছেন—

- গ্রামীণ মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার নির্মোহ উপস্থাপন। এবং
- মানুষের জৈব প্রবৃত্তিকে অমানবীয় স্বরূপে অন্বেষণ করা।

আসলে উপন্যাসের আধারে ভৌগোলিক ভূ-খণ্ডের মানুষগুলির পূর্ণাঙ্গ জীবন তুলে ধরা খুব কষ্টসাধ্য কাজ। জগদীশগুপ্ত তাঁর উপন্যাস সাহিত্যে জীবনের এই রূপ দুটির যথাযথ উপস্থাপন করেছেন। এবং বৈপরীত্য পূর্ণ গ্রাম জীবনের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করেছেন। এই পরিচয়ের যথার্থতা উপলব্ধির জন্য সমকালীন বাংলাদেশের গ্রাম জীবনকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অন্বেষণ করে দেখা দরকার।

বাস্তবিক জগদীশ গুপ্ত জন্মেছিলেন বাংলাদেশের যে গ্রামীণ পরিবেশে, তার অতীত শিকড় বহুদূর পর্যন্ত প্রোথিত ছিল। এয়োদশ শতকের সূচনা থেকে বিংশ শতকের প্রায় প্রথমার্ধ পর্যন্ত দীর্ঘ সাড়ে সাতশ বছরের বিদেশী শাসনে বাঙালী জাতির মেরুদণ্ডটাই ভেঙ্গে গিয়েছিল। তারও অনেককাল আগে আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ জয়ের ইচ্ছা করেছিলেন, তখন মগধের সান্নিধ্য পর্যন্ত এসে ফিরে গিয়েছিলেন। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন সেই ইতিহাস বিবৃত করতে

গিয়ে জানিয়েছেন—''তাঁহার (আলেকজাণ্ডারের) সৈন্যেরা মগধাধিপতের সৈন্য সংখ্যা ও বীরত্ব প্রভৃতির যে সংবাদ পাইয়াছিল, তাহাতে তাহারা আর এক পাও অগ্রসর হইবে না, এরূপ সঙ্কল্প করিয়া বসিল। আলেকজাণ্ডারকে ঘোরতর অনিচ্ছার সহিত ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল।"[৪]

অতীতের সেই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের প্রথম ছেদ পড়ে এয়োদশ শতকের সূচনাতেই বখ্‌তিয়ার খলজির নেতৃত্বে তুর্কী আক্রমণ এবং সেই আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে রাজা লক্ষ্মণসেনের ভীরু কাপুরুষের মত সিংহাসন ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া বর্ণিত হয়েছে। সতেরজন অশ্বারোহী নিয়ে বঙ্গ বিজয়ের এই কাহিনী বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম প্রশ্ন তুলেছিলেন। বঙ্কিম তাঁর 'মৃণালিনী' (১৮৬৯) উপন্যাসে এই বিজয়ের কাহিনী বর্ণনা করেছেন ঐতিহাসিক মিনহাজ উদ্দীনের বিবৃতি অনুসরণ করে। কিন্তু তিনি এই কাহিনী বিশ্বাস করেননি। সে জন্য সমগ্র হিন্দু জাতির কলঙ্ক মোচনের জন্য এই উপন্যাসে ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণ করে দেখাতে চেয়েছেন, এই পরাজয়ের অন্তরালে সক্রিয় ছিল লক্ষ্মণসেনের প্রধান অমাত্য পশুপতির হীন ষড়যন্ত্র। এই অভাবনীয় পরাজয়ের পেছনে পশুপতির মত দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতা একেবারে অকল্পনীয় বা অসম্ভব নয়। এই সূত্রেই তিনি বাঙালীর দুর্বলতারও কারণ নির্ণয় ক'রে তার মূলান্বেষণ করেছেন। তবে বঙ্কিমের বিশ্বাস-অবিশ্বাস যাই থাক না কেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ এটাই আমাদের ইতিহাস। মেনে নিতে হয়েছে। এরপর দীর্ঘ সময় মুসলমানি শাসন বজায় ছিল। বাঙালীর দাস বৃত্তিও চলেছে দীর্ঘ পথ পরিক্রমার মধ্যদিয়ে। তুর্কী আক্রমণের ইতিহাসগত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক যাই থাক না কেন, এই বিজয় অভিযান এদেশে কেবলমাত্র একটি বৈদেশিক আক্রমণের ঘটনামাত্র ছিল না। তাদের ভারতে আসার ফলে এদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন ঘটে। সেদিক থেকে এই আক্রমণ শুধু বিজয় অভিযান ছিল না; একে বিপ্লবও বলা যায়। এই বিজয় সম্পর্কে অধ্যাপক প্রভাতাংশু মাইতি লিখেছেন— "... তুর্কী বিজয়ের পর ভারতে পুনরায় কেন্দ্রীয় শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। তুর্কী সুলতানের সিংহাসন ছিল এই কেন্দ্রীয় ক্ষমতার আধার। একে কেন্দ্র করে ভারতে পুনরায় রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ঐক্য ফিরে আসে।"[৫]

বস্তুত এই তুর্কী আক্রমণের প্রচণ্ড আঘাতে বাঙালীর জীবন নানা দিক থেকে বিপন্ন ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। হোসেন শাহের রাজত্বকালে ধীরে ধীরে সমাজ জীবনে শান্তি ফিরে আসে।

ইতোপূর্বে দেশে কৌলিন্য প্রথা বর্ণভেদ আর জাতিভেদ খুব কঠোর ভাবে বাংলাদেশের সমাজ দেহে স্থায়ী ব্যাধির আকার নিয়েছিল। সমাজের তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর সঙ্গে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হৃদয়ের কোনো সংযোগ ছিল না। চর্যাপদের ৩৩ সংখ্যক পদে ফুটে উঠেছে সেই অবক্ষয়িত বিচ্ছিন্ন সমাজচিত্র। যেখানে আমরা দেখি নিম্নবর্ণের মানুষগুলির ঠাঁই হয়েছিল মূল গ্রাম সমাজের বাইরে।

''টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।''[৬]

শুধু তাই নয় উচ্চশ্রেণীর মানুষরা সব সময়ই শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী শ্রেণীর মানুষদের অবজ্ঞার চোখে দেখত। নিম্নবর্ণের হিন্দুরা তখন দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। সেই অবক্ষয়ের কালবেলায় দাঁড়িয়ে উচ্চবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের চৈতন্যোদয় হয়। তারা হিন্দু জাতি, হিন্দু ধর্ম আর সংস্কৃতিকে ইসলামের আগ্রাসন থেকে বাঁচাতে তৎপর হয়ে ওঠে এবং নিম্নবর্ণের সঙ্গে ভেদাভেদ ভুলে মিলিত হবার জন্য সবকিছু বিসর্জন দিয়ে এগিয়ে আসে। উচ্চ-নীচ শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে একত্র মিলিত হয়ে সবাই এক অখণ্ড বাঙালী জাতি হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ পেল। ইসলাম ধর্মের প্লাবনকে ঠেকাতে গিয়ে সকলে মিলে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল। হিন্দু সংস্কৃতির বড়ো আশ্রয় রামায়ণ মহাভারত ও ভাগবত ইত্যাদি পৌরাণিক গ্রন্থাদি বাংলায় অনুবাদ করে আপামর জনসাধারণের হাতে তুলে দিতে সমাজপতিরা প্রয়াসী হয়েছিলেন।

তুর্কি আক্রমণ পরবর্তীকালে দুই স্বতন্ত্র সত্যতা সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটে। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির মনোভাব থেকেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কৃতির সেতুবন্ধ রূপে সত্যপীরের পূজা ইত্যাদির প্রচলন হয়। এই অধ্যায়টি পরবর্তী সময়ের পট পরিবর্তনের ধারা বইতে থাকে দীর্ঘ দুশো বছর ব্যাপী। মাঝে দিল্লীর সুলতানী শাসন থেকে শুরু করে হোসেন শাহের এবং তার পরে তাঁর পুত্র নুসরৎ শাহের শাসনে বাংলায় সমাজ ও সংস্কৃতির বিস্তার ঘটে। এবং আবির্ভূত হন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩)। চৈতন্য রেনেসাঁর পথে বাংলাদেশে একটি নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল। এরপর ১৫২৬ খ্রীঃ পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের জয় লাভের মধ্যদিয়ে এদেশে মুঘল শাসনের প্রতিষ্ঠা ঘটে।

মুঘল সম্রাট বাবর থেকে আকবর হয়ে মূলতঃ ঔরংজেব পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশের

সমাজ ও সভ্যতায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছিল। এই পরিবর্তনের ধারা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ বলেছেন যে, একমাত্র ব্রিটিশ শাসনে বাংলার আধুনিকীকরণ ছাড়া এরকম গভীর পরিবর্তন আর দেখা যায়নি। বস্তুতঃ এই সময়ের আগে বাংলাদেশ অবশিষ্ট ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন সুলতানির অধিনস্থ ছিল। মুঘল যুগে এসেই সেই বিচ্ছিন্নতা দূর হয়ে এদেশের সমাজ জীবন সমগ্র ভারতভূমির মূল স্রোতের সঙ্গে মিলিত হয়ে যায়। সম্রাট আকবরের শাসনকাল থেকেই বাংলার সমাজজীবনে এই পটপরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশ শাসনের জন্য বিভিন্ন সরকারী পদে দিল্লী থেকে বিশিষ্ট মুসলিম আমলারা এসেছিলেন। তাঁদের শাসনের মধ্যদিয়ে বাংলার সমাজ-সাংস্কৃতিক জীবনে নতুন অধ্যায় সূচিত হয়ে যায়। এই মুঘল আমলে সারাদেশের সমান্তরালভাবে বাংলার অর্থনীতিও মূলত তিনটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়েছিল কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্য। আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থ সূত্রে জানা যায় বাংলার প্রধান কৃষিজ ফসল ছিল ধান। এই ধান থেকে জাত চাল দেশের অন্যান্য স্থানে রপ্তানি পর্যন্ত করা হত। বঙ্গভূমির কোনো কোনো অঞ্চলের কৃষিকাজ এত উন্নত ছিল যে সেখানের অধিকাংশ জমি ছিল তিন ফসলী। সেই সঙ্গে ধান ছাড়াও আখ, নারকেল, আম, পাট, তামাক, সরষে, নীল ও সুপারি ইত্যাদি উৎপাদিত হত। অন্যান্য সম্প্রদায়ের পাশাপাশি ব্রাহ্মণরাও এই কৃষিকাজের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিল। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যসূত্রে এবিষয়ে বিস্তৃত জানা যায়। প্রসঙ্গত কবির পূর্বপুরুষদেরই জীবিকা ছিল কৃষিকাজ করা।

সম্রাট আকবরের শাসনাধীনে বাংলাদেশের সমাজজীবনের সংস্কার শুরু হলেও তা ব্যাপকতা লাভ করে সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমল থেকেই। এই সময়ের বাংলাদশে বস্ত্র ও রেশম শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়। এখানকার উৎপাদিত বস্ত্র এদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ছাড়াও বাংলার প্রায় ঘরে ঘরে উৎপন্ন সরবতী, মলমল, নয়ন সুখ, তঞ্জীব প্রভৃতি সৌখিন শাড়ি বিদেশেও রপ্তানি হত। বাংলার বণিকেরা সেসব জাহাজে এবং বড়ো বড়ো ডিঙ্গায় বোঝাই করে সমুদ্রপথে বিদেশে বাণিজ্য করতে যেত। মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত, বিশেষ করে মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগর ও চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি সওদাগরের 'সপ্তডিঙা মধুকর' ভাসিয়ে বাণিজ্যে যাবার বিবরণ পাওয়া যায়। এই বাণিজ্য সূত্রেই বাংলায় ইউরোপীয় বণিক জাতিগুলি মূলতঃ জাহাঙ্গীরের সময় থেকেই বাংলায় আসতে শুরু করেছিল। এই বাণিজ্যের ফসল

হিসেবে ইউরোপীয় বণিকরা ছাড়াও মুঘল রাজ-কর্মচারীরা বাংলার উদ্ধৃত্ত অর্থ নিয়ে যেতে শুরু করেছিল। সেইসঙ্গে দিল্লীতে নিয়মিত মোটা অঙ্কের রাজস্ব পাঠাতে হত। এই সংক্রান্ত দু'একটি তথ্য দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে—

- বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খাঁ ২২ বছরে ব্যক্তিগত ভাবে ৩৮ কোটি টাকা নিয়ে চলে গিয়েছিল।
- সুবেদার আজিম উস্-শান ৮ কোটি টাকা নেন।
- মুর্শিদকুলি খাঁ বছরে রাজস্ব বাবদ ১ কোটি টাকা দিল্লীতে পাঠাতেন।
- সুজাউদ্দিন খান বছরে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা পাঠাতেন।

এরকম ভাবে বাংলার অর্থ অবিরাম চলে যাবার ফলে এখানকার মানুষের দুর্দশা বাড়ে। তবে অর্থের একটা বড় অংশ বণিক ও শাসক শ্রেণীর হাতে জমা হয়ে এই বাংলায় এক ধনী ও বিলাসী শ্রেণীর উদ্ভবও হয়েছিল। ফলে মূল্য দিতে হয়েছে মূলতঃ সাধারণ মানুষকে। তাদের উপর জোর জুলুম করে স্থানীয় শাসক অর্থ আদায় করত। খাজনা দিতে না পারলে প্রজাদের স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি, স্ত্রী কন্যা পুত্র ইত্যাদিও নিলাম করে দেওয়া হত। এই দুর্দিনের পরিচয় আছে মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে—

''সরকার হইলা কাল খিলভূমি লিখে লাল
বিনি উবগারে খায় ধুতি।
পোতদার হইল যম টাকায় আড়াই আনি কম
পাই লভ্য লয় দিন প্রতি।
ডিহিদার আবুদ খোজ টাকা দিলে নাঞি রোজ
ধান্য গোরু কেহ নাঞি কেনে।
প্রভু গোপীনাথ নন্দী বিপাকে হইলা বন্দী
হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে।''[৭]

পাশাপাশি সাধারণের দুর্বিসহ জীবনেরও পরিচয় কবি দিয়েছেন তাঁর আত্মজীবনের বিবরণের মধ্যেও—

- ''উইচারা খাই আমি নামেতে ভালুক।
নেউগি চৌধুরী হই না করি তালুক।।''[৮]

■ '' তৈলবিনা করি স্নান কেবল উদক পান
শিশু কান্দে ওদনের তরে।
আশ্রয়ি পুখুর আড়া নৈবেদ্য শালুক নাড়া
পূজা কৈল কুমুদ প্রসূনে।''[৯]

কিংবা ফুল্লরার বারমাস্যার মধ্যেও আছে সেই দৈন্যতার দারিদ্র যন্ত্রণার কথা।

■ ''দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান
আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান।''[১০]

অথবা,

■ ''পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠমাস পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস
বেঙচের ফল খাইআ করি উপবাস।''[১১]

বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার এই অসম বন্টনের মধ্যদিয়ে শুধু অবক্ষয়িত সমাজের চিত্রই নয়, রাজনৈতিক ক্ষমতায়তনের ক্ষেত্রটিরও পরিবর্তন ঘটে। এই বাণিজ্যের হাত ধরেই ইংরেজদের বাণিজ্য কেন্দ্র কলকাতা নগরের দ্রুত উন্নতি, এবং সেই সঙ্গে ফরাসী বাণিজ্যকেন্দ্র চন্দননগর, ডাচ বাণিজ্য ঘাঁটি চুঁচুড়ার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয়ে মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছিল। মুঘলযুগে শিল্প বাণিজ্য আর কৃষির প্রভূত উন্নতির ফলে কেবল বাংলার সমাজদেহেই পরিবর্তনের ঢেউ লাগেনি, সমাজের আরেকটি অংশ হিসেবে মানুষের ধর্মীয় ভাবনার জগতেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এই মুঘল আমলেই এদেশে ১৪৮৩-১৫৩৩ খ্রীঃ পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়কালে আবির্ভূত হয়েছিলেন এক যুগাবতার—তিনি চৈতন্য মহাপ্রভু। তিনি তাঁর ভক্তি ধর্ম প্রচার করে ১৫৩৩ খ্রীঃ মারা যান। চৈতন্যদেব তাঁর ধর্মীয় ভাবনাকে স্থায়ীত্ব দেবার প্রয়াসে কোন সংগঠন বা সম্প্রদায় গড়ে যাননি। সেই কাজটি করেছিলেন পরে নিত্যানন্দ প্রভু। বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামী শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব গোস্বামী, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট এবং গোপাল ভট্ট মিলে বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে চৈতন্য প্রবর্তিত ধর্মের ভাবধারা পৌঁছে দিতে থাকেন। এই সময়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা আছে অধ্যাপক প্রভাতাংশু মাইতির কথায়— ''... বৈষ্ণবধর্মের সরল অনাড়ম্বর ভক্তিবাদ, বাংলার জনসাধারণের ধর্মে পরিণত হয়। বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে পশুবলি কারণবারি পান বা সুরাপান প্রভৃতি প্রথা থেকে লোকে বহুল পরিমাণে মুক্ত হয়। সাধারণ লোকের মধ্যে নৈতিক

মান বাড়ে। জাতিভেদ প্রথার তীব্রতা কমে। সমাজের নিম্নবর্ণের অশিক্ষিত, অবহেলিত শ্রেণীগুলি বৈষ্ণব ধর্ম থেকে সামাজিক মুক্তির আস্বাদ পায়।"[১২] এইভাবে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার বাংলার হিন্দু সমাজে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। বৈষ্ণব ধর্ম তার শ্রেষ্ঠত্বের গুণে বাংলা সীমানা ছাড়িয়ে আসাম, মণিপুর, ত্রিপুরায় প্রবেশ করে। ফলে এই ধর্মের বিস্তৃতি হয় উড়িষ্যা থেকে আসাম পর্যন্ত। কিন্তু মহাকাল বড়ো নিষ্ঠুর। কালোর ধর্ম মেনেই বৈষ্ণবীয় ভাব জগতেও মালিন্য প্রবেশ করতে থাকে। যার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের সমাজ পুনঃরায় পানা পুকুরে ভ'রে যায়, মজে যায়।

বৈষ্ণবধর্মের সমান্তরালে বাংলাদেশে রক্ষণশীল হিন্দুধর্ম তার দাঁত নখ বার করে আপন অস্তিত্বের পরিচয় দিয়েছে। এই ধর্মের বর্ণ ভেদাশ্রমের নিরীখে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের সঙ্গে কায়স্থ ও বৈদ্যরা কর্তৃত্ব করত। এদের মধ্যে কৌলিন্য প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল। এই প্রথার সুযোগ নিয়ে বর্ণ কুলীনেরা ইচ্ছেমত বিয়ে করত। আট-দশ বছরের মেয়েদের 'গৌরীদানে'র নামে বাল্যবিবাহ দিতে হত। কুলীন বৃদ্ধ স্বামীর অনিবার্য মৃত্যুর পরেই নেমে আসত 'সহমরণের' অভিশাপ। শিক্ষার আলো থেকে মেয়েদের অনেক দূরে রাখা হত। একটা সময়ের পর 'সহমরণ' বিলোপ হয়ে যায়। এবং বিধবাদের বেঁচে থেকে জীবন যন্ত্রণার পরিক্রমণ শুরু হয়ে যেত। অভিশপ্ত জীবন নিয়ে বিধবারা পূজার্চনা, পাঁচালী পাঠ কথকথা আর ন্যায়শাস্ত্র নীতিশাস্ত্র নিয়ে জীবনের বাকী দিনগুলো অতিবাহিত করতে হত।

১৭৫৭ সালে বাংলার ভাগ্যাকাশে পট-পবির্তন ঘটে যায়। 'বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড রূপে' দেখা দিলে আপামর বঙ্গবাসীর জীবন থেকে স্বাধীনতা সূর্য ডুবে যায়। শুরু হয় পরাধীনতার যন্ত্রণা ভোগ করবার নিরন্তন লড়াই। এই পরাধীনতার পঙ্কে নিমজ্জনের জন্যে কেবল মীরজাফরকেই দায়ী করা যায় কি? সে-ও সমাজ ইতিহাসের এক করুণ অলিখিত ইতিহাস। ১৭৬৪ সালে মীরকাশিম শেষ চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হলে রবার্ট ক্লাইভের হাতে বঙ্গবাসীর ভাগ্য নির্ধারণের পুরো ক্ষমতা বর্তায়। এবং ১৭৬৫ সালে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের মধ্যদিয়ে 'ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর'। তবে স্বাধীনতা সূর্য ডুবে গেলেও ব্রিটিশ শাসনাধীনে বঙ্গবাসীর মরচে পড়া চেতনার দুয়ারে কড়াঘাত লাগল খুব সজোরে। ৩৪৫ বছরের অর্গল ভেঙে ফাটল ধরল অচলায়তনে, মধ্যযুগীয় বাঙালীর মানসিকতায়। স্বপন বসু প্রসঙ্গত লিখেছেন—''অচলায়তনে ফাটল ধরল, অচলায়তনের নাম মধ্যযুগীয়

বাঙালি সমাজ। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের স্থিতিশীল, মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, নিজস্ব এক সাংস্কৃতিক জগতের অধিবাসী গ্রামীণ বাঙালি হিন্দু সমাজের কাছে বাইরের বৃহত্তর জগতের পরিচয় ছিল অনেকটাই অজানা। আর তাই প্রথা জীর্ণ, অবসাদগ্রস্ত, বহু প্রকার বিধি-নিষেধ ও সংস্কারে আচ্ছন্ন মধ্যযুগীয় বাঙালি সমাজ অচলায়তনেরই আর এক নাম।"[১৩]

ইংরেজ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ক্ষমতায়নের পর বাংলাদেশের সমাজ ও বাঙালীর চেতনার অচলায়তন শুধু ভাঙল তা নয়, একটা নতুন ভোরের আলোর উত্তেজনায় বাঙালীর নবজন্ম ঘটে গেল বলা যায়। দেওয়ানী লাভ পরবর্তী ব্রিটিশ শাসিত বাংলার বুকে ঘটে গেল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। এতোকালের অর্থনীতির বুনিয়াদ ভেঙে গিয়ে বাঙালী সমাজে কেবল অগণিত মানুষের মৃত্যু হল এমন নয়, বাংলার প্রাচীন অভিজাত যে বংশ ছিল তারাও নিমূল হয়ে গেল। নবজাগরণের সেই পরমলগ্নে ইংরেজদের স্তাবকতাকারী একশ্রেণীর ভুঁইফোড় সম্প্রদায়ের উদ্ভব হল। এতদিন বাঙালীর পরিচয় ছিল বংশ কৌলিন্য—যে কৌলিন্যের কথা বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা উল্লেখ করেছেন—

"কুল মরিয়াদ কপাট উদঘাটলুঁ
তাহে কি কাঠকি বাধা।"[১৪]

কিংবা চণ্ডীমঙ্গলে ভাড়ুদত্ত 'মহামণ্ডলে'র পদপ্রাপ্তির যোগ্যতা হিসেবে উল্লেখ করেছিল আপন বংশ গৌরবের কথা—

"ঘোষ বউষের কন্যা দুই নারী মোর ধন্যা
মিত্রে কৈল কন্যা বিতরণ।
গঙ্গার দুকূল কাছে জতেক কায়েস্ত আছে
মোর ঘরে করয়ে ভোজন।"[১৫]

এই বংশ মর্যাদার নিরীখে সামাজিক প্রতিপত্তি লাভের সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে গেল। শুরু হল আর্থিক কৌলিন্যের মাপকাঠি—যা এই একবিংশ শতাব্দীতেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। রাতারাতি অর্থলাভ আর কাজ চালানো গোছের ইংরেজী শিখে এইসব ছিন্নমূল বাঙালী নিজেদের অতীতের সমস্ত শিকড় ভুলে গেল। ডিরোজিওর নব্যবঙ্গ ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত তরুণদের মতো এইসব বিত্তকুলীন বংশ মর্যাদা শূন্য হঠাৎ নবাবদের রুচিবোধ ছিল অত্যন্ত স্থূল। তারা বাঈজি নাচ দেখতেন, ইয়ার-বন্ধুদের নিয়ে মদ-মাংস খেয়ে লাম্পট্য করতেন, ছেলেমেয়েদের বিয়ে কিংবা

বাবা-মায়ের শ্রাদ্ধে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে খরচ করতেন। ঘটা করে বাঁদরের বিয়ে দিতেন। দুর্গোৎসবের সময় সাহেবদের নিমন্ত্রণ করে মদ-মাংস খাওয়াতেন। মিথ্যা, বলে, ঘুষ দিয়ে কিংবা খেয়ে জাল-জুয়াচুরি করে অর্থ উপার্জনের দ্বারা সমাজের একজন হয়ে উঠতেন। একইভাবে হিন্দু কলেজে পড়া তরুণ তুর্কীর দল এতকালের সংস্কারকে ভাঙ্গার খেলায় মেতে উঠেছিল। এবিষয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন—

''...তাহারা রাজপথে যাইবার সময়, মুণ্ডিত মস্তক ফোঁটাধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখিলেই তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিবার জন্য 'আমরা গরু খাইগো আমরা গরু খাইগো' বলিয়া চীৎকার করিত। কেহ কেহ স্বীয় স্বীয় ভবনে ছাদের উপর উঠিয়া প্রতিবেশীগণকে ডাকিয়া বলিত, 'এই দেখ মুসলমানের জল মুখে দিতেছি' এই বলিয়া পিতা, পিতৃব্য প্রভৃতির তামাক খাইবার টিকা মুখে দিত।''[১৬]

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এইভাবে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের কারণে বঙ্গসন্তানেরা রক্ষণশীল—প্রগতিবাদী এবং এই দুইয়ের মধ্যবর্তী শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সহমরণ বাল্যবিবাহ, কৌলিন্যপ্রথা থেকে শুরু করে বিধবা বিবাহ, নারী শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি দিয়েছে। রাধাকান্তদেব বাহাদুর থেকে রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ নানা দলে-উপদলে ভাগ হয়ে গেলেন। ১৮২৮ খ্রীঃ এদেশে নতুন শাসক হয়ে এলেন উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক। ইংলণ্ডে থাকাকালীন সময়েই তিনি সতীদাহ প্রথা বিষয়ে অবহিত হয়েছিলেন। শাসনভার নিয়েই পরের বছর সতীদাহ প্রথা আইন করে বন্ধ করে দিলেন। রাজা রামমোহন ছিলেন এবিষয়ে তাঁর সবচেয়ে বড় সমর্থক; দেশব্যাপী নানারকম প্রতিক্রিয়া হল। একজন খ্রীষ্টান শাসকের নেতৃত্বে এভাবে সতীদাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রক্ষণশীল হিন্দুরা সনাতন ধর্ম লোপের আশংকা করতে লাগলেন। পত্র-পত্রিকা মারফত নানা বিতর্ক হলেও শেষ পর্যন্ত মধ্যযুগীয় ধারণাকে ভেঙ্গে বাঙালী নিজেদের জীবন থেকে সতীদাহ প্রথাকে বর্জন করতে পেরেছিল। এরপর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্যোগে নারী শিক্ষা আর বিধবা বিবাহ আইন প্রনয়ণের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। যথারীতি বিরুদ্ধ পক্ষ গড়ে ওঠে। সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার সম্পাদক ঈশ্বরগুপ্তের মতো সেদিনের কলকাতার প্রথম সারির নাগরিকরা নারী শিক্ষার বিরোধিতায় নামেন। গুপ্ত কবি এই নিয়ে ব্যঙ্গ করে তাঁর কবিতায় লিখলেন—

''আগে মেয়ে গুলো, ছিল ভালো,
ব্রত ধর্ম কোর্তো সবে।
একা 'বেথুন' এসে, শেষ কোরেছে,
আর কি তাদের তেমন পাবে?
যত ছুঁড়ী গুলো, তুড়ী মেরে
কেতাব হাতে নিজে যবে।
তখন 'এ.বি.' শিখে বিবি সেজে
বিলাতী বোল কবেই কবে।''[১৭]

বিধবা বিবাহের ক্ষেত্রেও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রক্ষণশীল ভাবনা থেকে অত্যন্ত কৌশলে বিদ্যাসাগরকে 'মূর্খ' বলে অভিযুক্ত করেছিলেন। তিনি তাঁর 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের নায়িকা সূর্যমুখীকে দিয়ে কমলমণির কাছে চিঠি লিখিয়ে ছিলেন—

''ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবা বিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?''[১৮]

রক্ষণশীল এই মানসিকতা ঈশ্বরগুপ্তেরও ছিল। তিনিও বিদ্যাসাগরের বিবাহ বিবাহের উদ্যোগকে সমর্থন জানাতে পারেন নি। বরং তীব্র আক্রমণ করে তাঁর কবিতায় লিখেছিলেন—

''অগাধ বিদ্যার বিদ্যাসাগর
তরঙ্গ তায় রঙ্গ নানা।
তাতে বিধবাদের 'কুলতরী'
অকূলেতে কুল পেলে না।
কূলের তরী থাকলে কুলে,
কুলের ভাবনা আর থাকে না।।
সে যে অকূল-সাগর, দারুণ-ডাগর,
কালাপানি বড় লোনা।
যখন সাগরে ঢেউ উঠেছিলো,
তখনি গিয়েছে জানা।।''[১৯]

যাবতীয় প্রতিকূলতা কাটিয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিচার করে দেখিয়েছিলেন বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত। এবিষয়ে তিনি তাঁর 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' পুস্তিকাটির একেবারে শেষে জানিয়েছেন—দুর্ভাগ্য ক্রমে যারা বাল্যকালে বিধবা হয়ে থাকে, তাদের সারাজীবনই এই বৈধব্যের অসহায় যন্ত্রণা ভোগ করে, সেটা যাদের মেয়ে, বোন পুত্রবধূ প্রমুখ অল্প বয়সী বিধবা আছে তাঁরা খুব ভালো করেই জানে; অনেক অনেক বিধবা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে ভ্রূণহত্যার মতো পাপ কাজে লিপ্ত হচ্ছে। এবং তারা স্বামী, শ্বশুর এবং মাতৃকুল কলঙ্কিত করছে। তাই বিধবা বিবাহ নিয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যুক্তি ছিল—''বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলিত হইলে অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণা, ব্যাভিচারদোষ ও ভ্রূণহত্যা পাপের নিবারণ ও তিনকুলের কলঙ্ক নিরাকরণ হইতে পারে। যাবৎ এই শুভকরী প্রথা প্রচলিত না হইবেক, তাবৎ ব্যাভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত, কলঙ্কের প্রবাহ ও বৈধব্য যন্ত্রণার অনল উত্তরোত্তর প্রবল হইতেই থাকিবে।"[২০] বাস্তববাদী বিদ্যাসাগর মহাশয় বুঝেছিলেন বিধবা বিবাহকে কাগজ কলমে শাস্ত্র সম্মত প্রমাণ করা সম্ভব হলেও, সমাজ ও রাষ্ট্রের সমর্থন ছাড়া একে কার্যকর করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। সেই অনুযায়ী তিনি যাবতীয় প্রক্রিয়া চালিয়ে যান এবং ২৬ শে জুলাই ১৮৫৬ খ্রীঃ বিধবা বিবাহ আইন সম্মত হয়। কিন্তু আইন প্রণীত হলেও সমাজের মাটিতে দীর্ঘকাল ধরে প্রোথিত সংস্কারকে সহজে মূলোচ্ছেদ করা সম্ভব হয়নি। তবে এই আইন প্রণয়ন বাংলাদেশের সমাজ সাহিত্যে এক যুগান্তকারী ঘটনা। একবিংশ শতাব্দীর এই প্রান্তে দাঁড়িয়েও সকল বিধবার বিবাহ সমাজ মেনে নিতে পারে না। তবুও এই ঘটনা বাংলা উপন্যাসের ধারাকে একটা বিশেষ বাঁকে পৌঁছে দিয়েছিল। সতীদাহ প্রথা রদ থেকে বিধবা বিবাহ (১৮২৯-১৮৫৬), সেইসঙ্গে বাল্যবিবাহ রদ, কৌলিন্য প্রথার বিলোপের আন্তরিক প্রয়াস আর নারী শিক্ষার পরিসর রচিত হতেই বাংলা উপন্যাসের বিশেষ করে সামাজিক উপন্যাসের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে আমরা প্রথম সার্থক বাংলা উপন্যাস পেলেও প্রাক্-বঙ্কিম স্তরেই তার পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছিল। বিশেষ করে সামাজিক প্রেক্ষাপটে লেখা হ্যানা ক্যাথারিন মুলেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (১৮৫২), প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮), লাল বিহারী দে'র লেখা 'চন্দ্রমুখীর উপখ্যান' (১৮৫৯) প্রভৃতি রচনায় সমাজজীবনের চিত্র বিক্ষিপ্তভাবে হলেও ফুটে উঠেছে। মূলতঃ খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত হলেও মুলেন্সের রচনাটিতে সমাজের একটা চিত্র পরিস্ফুট

হয়েছে। দুটি বাঙালী খ্রীষ্টান পরিবারের মধ্যে ফুলমণির পরিবার ধর্ম মেনে চলে বলে তারা শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করে। আর করুণার পরিবার ধর্ম না মানার ফলে তাদের জীবনে নেমে এসেছে ট্রাজেডির ঘোর অন্ধকার। রচনাটি সম্পর্কে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—'' 'ফুলমণি ও করুণা' গ্রন্থটির প্রধান কৃতিত্ব হইল যে, ইহা ব্যঙ্গ বিদ্রূপের খিড়কি দরজা দিয়া উপন্যাসের উচ্চমঞ্চে প্রবেশ করে নাই। ইহা সর্বপ্রথম জীবনের গভীর সমস্যা, পারিবারিক জীবনের সুখ শান্তি, জীবনের সুমিত নীতি নিয়ন্ত্রণ, দুষ্প্রবৃত্তির উন্মুলন প্রভৃতি অবলম্বনে রচিত কাহিনী।"[২১] অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ এবং উনিশ শতকের গোড়ার দিকের কলকাতা ও শহরতলীর চিত্র 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ অঙ্কিত হয়েছে। কুশিক্ষা ও সৎসঙ্গের অভাবে মানুষের অধঃপতন এবং যথোচিত শিক্ষা ও দৃষ্টান্তের ফলে সেই অধঃপতন থেকে মুক্তি—মতিলাল চরিত্রটির বিবর্তনের মধ্যদিয়ে লেখক এটাই তুলে ধরেছেন। সেসময় বাবু রামবাবুর মতো আলালরা নানাভাবে অপরিমিত ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে বাবুগিরিতে যে গা ভাসিয়েছে এবং তাদের নৈতিকতা ও মনুষ্যত্ব যে ছিল না সেটা লেখক যথাযথভাবে বিবৃত করেছেন। বাবুরামের জীবন যাত্রার অপরিহার্য অঙ্গরূপে ধনীর প্রসাদলোভী ব্রাহ্মণ পুরোহিতের চিত্রও লেখক অংকন করেছেন। প্রচলিত সংস্কার প্রথা, অনুষ্ঠানের অনুরাগী বাবু রামবাবু কৌলীন্য প্রথার সমর্থক ছিলেন। লেখকের খানিকটা বর্ণনা এরকম—''বাবুরামবাবু বলরাম ঠাকুরের সন্তান, এজন্য জাতি-রক্ষার্থে কন্যাদ্বয় জন্মিবামাত্র বিস্তর ব্যয় ভূষণ করিয়া তাহাদের বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু জামাতারা কুলীন, অনেক স্থানে দার পরিগ্রহ করিয়াছিল—বিশেষ পারিতোষক না পাইলে বৈদ্যবাটীতে উঁকি মারিত না।"[২২] কলকাতার বাবু সমাজের ব্যাভিচারের দলিল এই গ্রন্থ। লাল বিহারী দে সম্পাদিত 'সম্বাদ অরুণোদয়' নামক পাক্ষিক পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাটি পরে লালবিহারী দে'র লেখা 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' (১৮৫৯) হিসেবে প্রমাণ করেছেন অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য। চন্দ্রপুর গ্রামের মেয়ে চন্দ্রমুখীর বেড়ে ওঠা, তার পড়াশুনা করা শত বিরোধিতার মধ্যেও, তারপর হেমচন্দ্রের সঙ্গে বিবাহ, ধীরে ধীরে হেমচন্দ্রের 'বাবু' হয়ে ওঠা; শেষে কুসঙ্গে পড়ে তার অধঃপতিত হওয়ার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে গ্রন্থটিতে। উনিশ শতকের বাঙালী জীবন ও মননের পরিচয় আছে এই রচনায়। 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর মতিলাল বাবু সমাজের প্রতিনিধি কিন্তু এই রচনার হেমচন্দ্র ধনীর দুলাল নয়; পাশ্চাত্য শিক্ষার অভিঘাতে পরিবর্তিত জীবনবোধের একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত তার মধ্যে ছিল। প্রাক্-বঙ্কিমপর্বের

এই রচনাগুলি বঙ্কিমের সামাজিক উপন্যাসের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। এই দিকটির ওপর আলোকপাত করে ড. বেলা দাস লিখেছেন—''... বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ'-এর নগেন্দ্রনাথ, 'কৃষ্ণকান্তের উইল' -এর গোবিন্দলাল চরিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে দেখিয়েছেন সুশীল ও সৎ চরিত্র নায়কেরা কোন পথে অধঃপাতে তলিয়ে গেছেন। এদিক দিয়ে দেখলে বঙ্কিমের উপন্যাসে 'আলালের ঘরের দুলাল' এর মতিলাল অপেক্ষা হেমচন্দ্রের পরোক্ষ হলেও ক্রম পরিণতির একটা ছায়া অনুভব করা যায়।"[২৩] এরই সঙ্গে সমসাময়িককালের ঘটনা যেমন নারী শিক্ষা, বিধবা বিবাহ, সামাজিক বর্ণ বৈষম্য, পারিবারিক রীতিনীতির বর্ণনা, নানা আচার অনুষ্ঠানের বিবরণ ইত্যাদির নিরীখে সমাজ ও পরিবার জীবনের দলিল হয়ে উঠেছে রচনাগুলি।

বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশ নন্দিনী'—'সীতারাম' বাংলা উপন্যাসকে একটা শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। বিশেষ করে সামাজিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁর 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাস দুটি মূল স্তম্ভ স্বরূপ। এরপর রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসের সমাজ ভাবনা দিয়ে সেই স্তম্ভের ওপর গৃহ নির্মাণ করেছেন এবং শরৎচন্দ্র এসে তাকে পূর্ণাঙ্গ গৃহের রূপ দিয়েছেন সাজিয়ে গুছিয়ে। তবে এই তিন লেখকের উপন্যাসগুলির অন্দরমহলে প্রবেশ করলে একটা সুস্পষ্ট রূপরেখা আমরা পেয়ে যাই। এঁদের প্রত্যেকের প্রতিনিধি স্থানীয় উপন্যাস, বিশেষত সামাজিক উপন্যাস হিসেবে একটা করে উপন্যাসকে তুলে ধরে প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যকে অনায়াসেই চিহ্নিত করা যায়—

- 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭২)
- 'চোখের বালি' (১৯০৩) এবং
- 'পল্লী সমাজ' (১৯১৬)

'বিষবৃক্ষে' লেখক দেখিয়েছেন বিধবা রমণী যদি বিবাহিত পুরুষের প্রতি আসক্ত হয় তাহলে সেই সম্পর্ক সমাজের মাটিতে বিষবৃক্ষের বীজ বপণ করে। এখানে তিনি বিবাহিত নগেন্দ্রর সঙ্গে কুন্দনন্দিনীর বিয়ে দিয়ে সেই সমস্যাকেই প্রকট করে দেখিয়েছেন। এবং সমাধান কল্পে বিধবা কুন্দকে বিষ খাইয়ে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। এখানে বিধবার বিবাহ সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক বলে চিহ্নিত হয়েছে। 'চোখের বালিতে' রবীন্দ্রনাথ বিধবা বিনোদিনীর প্রেমকে স্বীকৃতি দিয়েছেন কিন্তু বিহারীর সঙ্গে তার বিবাহ দেননি। আসলে তিনি চেয়েছিলেন সমাজ সমাজ আগে বিধবার প্রেমকেই স্বীকৃতি দিক, তারপর তার বিয়ের কথা ভাবা যাবে।

আর শরৎচন্দ্র বিধবা রমা আর রমেশকে নিয়ে একটিমাত্র মধুর মুহূর্ত সৃষ্টি করলেন—সেটাও পরিচিত বাংলার সমাজ বৃত্তের বাইরে। কুঁয়াপুর ছাড়িয়ে তারকেশ্বরে—যেখানে রমা রমেশকে কেউ চেনে না। তারপর রবীন্দ্রনাথের মতো রমাকে বিনোদিনীর পথে কাশী পাঠালেন। কিন্তু উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য সত্ত্বেও আপাতদৃষ্টিতে পরিণতি একইরকম মনে হয়। বিধবাদের নিয়ে তিন লেখকের এই তিনরকম পরিণতিকে একটি উপমার সাহায্যে তুলে ধরা যেতে পারে। ধরা যাক 'সমাজ' হল একটি টেবিল—যার শরীরময় ঘুণপোকা বাসা বেঁধেছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রক্ষণশীল ভাবনা থেকে এই টেবিলকে অক্ষতই রাখতে চেয়েছেন। কোনোরকম সংস্কার বা পরিবর্তন তাঁর কাঙ্ক্ষিত ছিল না। আর যে বা যারা এই পরিবর্তনের পথে হেঁটেছে সেইসব চরিত্রকে তিনি পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছেন অনায়াসেই। 'কুন্দনন্দিনী' কিংবা 'রোহিণীর পরিণতি'; এমনকি দেবেন্দ্রর কদর্যরোগে মৃত্যু আর হীরাদাসীর উন্মাদিনী হয়ে যাওয়া কিংবা শৈবলিনীর পরিণতি তারই বার্তা বহন করে। আর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ধীরে ধীরে পরিবর্তনের পক্ষে। তিনি পা ভেঙ্গে যাওয়া কিংবা ওপরের ছাউনির দু-একটি করে কাঠ বদলে দিয়ে দিয়ে এগোতে চেয়েছেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র ছিলেন ঘুণ ধরা টেবিলটি সম্পূর্ণ বাতিল করে নতুন টেবিল আনার পক্ষে। অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাবনার পথ ধরেই এগিয়ে গেছেন।

বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের এই পৃথক দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি যদি তাঁদের উপন্যাসে বর্ণিত সমাজের দিকে আলোকপাত করি তাহলে দেখা যাবে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের সামাজিক উপন্যাসের নায়করা সকলেই উচ্চবিত্ত, অনেকেই জমিদার, পড়াশুনা জানা মানুষ। নগেন্দ্রনাথ কিংবা গোবিন্দলাল সম্পন্ন জমিদার। হীরাদাসীর মতো গৌণ চরিত্রকে বাদ দিলে মাটি ঘেঁষা জীবনের পরিচয় বঙ্কিমের সামাজিক উপন্যাসে নেই বললেই চলে। রবীন্দ্রনাথের মহেন্দ্র বিহারী থেকে সন্দীপ-নিখিলেশ কিংবা মধুসূদন এদের কারও সঙ্গেই মৃত্তিকার খুব একটা সংযোগ নেই। প্রত্যেকেই প্রায় শিক্ষিত ও ধনীক শ্রেণী। এরপর শরৎচন্দ্রেই প্রথম বাংলাদেশের মাটির গন্ধ পাওয়া যায় তাঁর উপন্যাসে। 'বড়দিদি' থেকে 'বিপ্রদাস'—সব সামাজিক উপন্যাসগুলিতেই বাস্তবতার ছোঁয়া আছে। কিন্তু সেই বাস্তবতা যতটা রক্তমাংসের জীবনের সঙ্গে অন্বিত, তার চেয়ে অনেক বেশী আদর্শায়িত এক কল্পলোকের উত্তাপ রয়েছে। যাবতীয় কুসংস্কার-অশিক্ষা-জাতপাতের উর্ধে উঠে রমেশ যে আদর্শ সমাজের নায়ক বা জমিদার হয়ে উঠেছে তাঁর বাস্তব ভিত্তি কতটা? বরং উপন্যাসের শেষে বেণী ঘোষালের মতো জমিদারের

অন্তর্নিহিত স্বরূপের কোন পরিবর্তন ঘটে নি। তা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের চরিত্রেরাই মাটির কাছাকাছি অবস্থান করেছে—একথা অস্বীকার করা যায় না। আসলে শরৎচন্দ্র বাঙালী পাঠকের ভাবাবেগে আঘাত করে গল্প লিখেছেন। তিনি জানতেন কীভাবে পাঠকের অশ্রুগ্রন্থি থেকে লোনা জল বের করতে হয়। সেজন্যে এখনো তিনি সমান জনপ্রিয়।

শরৎচন্দ্রের 'মানসপুত্র' হিসেবে জগদীশবাবু তাঁর উপন্যাসে যে সমাজের ছবি অংকন করেছেন, তার কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা পাঠকের ছিল না বললেই চলে। বাংলাদেশের গ্রাম সমাজকেন্দ্রিক জীবন নিয়ে লেখা তাঁর তিনটি উপন্যাস—'রোমন্থন' (১৯৩১), 'দুলালের দোলা' (১৯৩১) এবং 'যথাক্রমে' (১৯৩৩)। এই তিনটিকে একত্রে 'ত্রয়ী' উপন্যাসও বলা যায়, যেগুলোতে গ্রাম সমাজ তার নিজের স্বরূপে প্রথম ধরা পড়েছে। এই তিনটি উপন্যাস ছাড়াও 'অসাধু সিদ্ধার্থ', 'গতিহারা জাহ্নবী', 'লঘুগুরু', 'নন্দ আর কৃষ্ণা', 'কলঙ্কিত তীর্থ' প্রভৃতি উপন্যাসেও এক নগ্ন সমাজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আসলে ব্যক্তিগত জীবন গ্রামের দূষিত জলহাওয়ায় বেড়ে উঠেছিল জগদীশবাবুর। তিনি খুব কাছ থেকে অশিক্ষা-দারিদ্র-জাতপাত। মানুষের লোভ লালসার কদর্যতম দিকগুলো প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সাহচর্য পেয়েছিলেন গণিকাদের। গ্রাম্য দলাদলি এবং তার বিষময় পরিমাণ তিনি আদালতে টাইপিস্টের কর্মসূত্রে রোজই দেখতেন। সেইসব চোখে দেখা জগৎই তাঁর এই ধারার উপন্যাসের মূল ভিত্তি। উনিশ শতকের শেষার্ধে একদিকে নবজাগরণের আলোর বিচ্ছুরণ ঘটে গেলেও পুনরায় বাংলাদেশের গ্রাম জীবনে অবক্ষয়ের ভাঙন শুরু হয়ে গিয়েছিল। একদিকে আর্থিক স্বচ্ছলতা আর অন্যদিকে সামাজিক সৌহার্দ্য সম্প্রীতির বন্ধন থেকে মানুষের জীবনের গতি বদলে যায় অনিশ্চয়তার অন্ধকারের দিকে। বিশ শতকের গোড়ার দিকে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানুষের নিঃসঙ্গতা ও একাকীত্বের যন্ত্রণা। সেই 'অদ্ভুত আঁধার'ময় সমাজের মানুষ সম্পর্কে সমালোচক সরকার আবদুল মান্নান লিখেছেন—''...দু'দুটি বিশ্বযুদ্ধের নানামুখী প্রভাব প্রতিক্রিয়ায় গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে তাদের অজান্তেই এক নিরুদ্দিষ্ট ছিন্নমূল অবস্থানে এনে দাঁড় করায়। ফলে পুঁজিবাদী ও শিল্প সর্বস্ব ইউরোপীয় সমাজ ব্যবস্থায় alien-ation বা বিচ্ছিন্নতাবোধ নামক যে অসুখ পুরো সমাজ-সংগঠনকে রুগ্‌ণ ও নিষ্প্রাণ করে তুলেছিল, ঠিক অনুরূপ অর্থে না হলেও বিশ শতকের গোড়া থেকেই আমাদের গ্রামীণ জীবনে চলছিল যথাসর্বস্ব অনিকেত অবস্থা।''[২৪] সমাজবদ্ধতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে নানা বিচ্যুতির আঘাতে

সমাজ মানুষের এই নিঃসঙ্গতা ও 'অনিকেত অবস্থা' অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। বিচ্ছিন্নতার এই গড়পরতা অবস্থা আর অশিক্ষা এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য বাংলাদেশের মানুষগুলোকে মূল্যবোধ থেকে, নৈতিকতা থেকে দূরে নিক্ষেপ করে দেয়। জগদীশবাবু অত্যন্ত নির্মোহ দৃষ্টি দিয়ে মানুষগুলিকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন।

জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই জগদীশগুপ্ত বুঝেছিলেন কল্পনার রঙীন চশমার পরিবর্তে, আবেগের ফানুসে না ভেসে চারপাশের সমাজকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। স্বভাবতই তিনি যখন বাংলাদেশের গ্রাম সমাজের চিত্রাঙ্গণ করতে নিয়েছেন তাঁর 'রোমন্থন' উপন্যাসে তিনি ভূমিকাতেই শুধু উপন্যাসটির আঙ্গিকগত দিকটি বিষয়েই তাঁর অকপট মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন এমন নয়, বিষয়ের দিকটি সম্পর্কেও তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত ছিল। তিনি মনে করতেন ঘটনার কল্পনায় গভীরতা থাক বা না থাক, পল্লীজীবনের সঙ্গে মনের নিবিড় 'আত্মীয়তা জন্মিবার পক্ষে তাহা সুদূরাগত বা প্রত্যক্ষ অন্তরায় হইতে পারে কিনা তাহাই বিবেচ্য'। ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রবোধের কারণে পল্লীবাংলার সঙ্গে কোনো মানুষেরই নিবিড় আত্মীয়তা গড়ে ওঠা সম্ভব নয়; কারণ কুসংস্কারে জরাজীর্ণ পল্লীর জীবনই এই আত্মীয়তার পক্ষে বাধা-স্বরূপ এটা জগদীশবাবুর মত প্রখর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। পল্লী সমাজের সেই কদর্য রূপের ছবি শরৎচন্দ্রও এঁকেছিলেন; কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত ভাব-কল্পনার পথেই অগ্রসর হয়েছেন। 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে যে বিশ্বেশ্বরী বা শরৎচন্দ্রের অন্তর্গত সত্তা রমেশকে জ্ঞানের আলো জ্বালাবার কথা বারবার বলেছেন, তাঁকে রক্তমাংসের সজীব মানুষ বলে মনেই হয় না। তিনি যেন একটি আদর্শের প্রতিমূর্তিমাত্র। অথচ জগদীশবাবু তাঁর 'রোমন্থন' উপন্যাসে বাংলার সমাজের যে কদর্য রূপ তুলে ধরেছেন এবং ডাক্তার নিত্যাপদর মানসিকতাকে শেষ পর্যন্ত পর্যুদস্ত করেছে যে ক্লেদ-পঙ্কিলতা—তা অত্যন্ত বাস্তব সম্মত এবং নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গিজাত। উপন্যাসটির 'মুখবন্ধে' শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ খুব স্পষ্ট করেই সেকথা জানিয়েছেন—''রোমন্থনে' পল্লীর কদর্য্যতা ক্ষুদ্রতা ও ক্লেদ ফুটেছে একটু বেশি বস্তুতান্ত্রিকতা ঘেঁষে, অপদার্থ ধনী সহুরে বাবু তিনটির আশেপাশে অভয় কালোশশী প্রাণনাথ মদন ও গ্রাম্য মানুষগুলি আসছে যাচ্ছে এক বিচিত্র দৈন্যের ছবি ফুটিয়ে। সুন্দরকে ছেড়ে বৃহতের মহিমাকে ছেড়ে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে একেবারে সঙ্কীর্ণতা ও রিক্ততার পঙ্কে তা' 'রোমন্থনে' দেখানো হয়েছে অপূর্ব্ব করে।"[২৫] উপন্যাসের কাহিনীতে

আমরা দেখি, কলকাতাস্থ একই পরিবারের তিন ভাই—বড়বাবু, মেজবাবু ও ছোটবাবু লণ্ডন প্রবাসী জেঠা মশায়ের আদেশে কলকাতা থেকে ৪২ মাইল দূরে মান নগর গ্রামে আসেন তাদের আদি নিবাসে। 'ইহাদের পিতামহ সেই পল্লীভবনের মাটিতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি এবং তাহার পত্নী চিতায় উঠেন কলিকাতায়'। চিরকুমার জেঠা মশায় আসন্ন পার্লামেন্ট মহাসভার প্রার্থী হিসেবে বিজয়ী না হতে পারলে পাকাপাকিভাবে দেশে ফিরে গ্রামের বাড়ীতেই এসে থাকবেন। সেজন্য যাবতীয় ব্যবস্থা তদারকি করতেই তিন ভ্রাতুস্পুত্রের গ্রামের বাড়ীতে আগমন। গ্রাম জীবনে পোকা-মাকড় সাপ-জোঁক, মশা-মাছি প্রভৃতি মনুষ্যেতর প্রাণী আর অসুখ-বিসুখ সম্পর্কে ভ্রাতৃত্রয়ের শহরবাসী হিসেবে একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল। কলকাতাস্থ বাড়ীর বৈঠকখানায় ডাক্তার মনোজবাবু গ্রামীর পরিবেশের চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর উপদেশাত্মক কথার মধ্যদিয়ে—

''মনোজবাবু বলিলেন,—কিন্তু 'জার্ম' লোকের বিছানাতেই বজ্‌বজ্‌ করছে—বিছানা ত কাচে না, রোদে দেয় না কোনো কালে! আত্মীয়তা করে' হঠাৎ তাদের বাড়ীতে গিয়ে উঠো না যেন।"[২৬]

কিংবা ''মশারি নিতে ভুলো না—পাড়াগাঁয়ের মশা খুব সেয়ানা! খুব শক্ত মশারি নিও, যেন সুতো ঠেলে ঢুকতে না পারে।"[২৭]

এইভাবে গ্রামজীবন সম্পর্কে পূর্ব কিছু অভিজ্ঞতা আর উপদেশ নিয়ে তারা গ্রামে আসেন। কিন্তু গ্রাম-সমাজের মানুষকে তারা যথার্থই চিনতেন না। এখানে এসে সেই নীচতা দৈন্যতা হীনতার সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে। এ যেন হারানো অতীতের স্মৃতি রোমন্থন। কলকাতার বাড়ী থেকে একটা দীর্ঘ প্রস্তুতি শেষে অনেকটা রোমাঞ্চকর অভিযানের মতো তারা গ্রাম জীবনে প্রবেশ করেছেন। এই জীবনের কৃষক প্রতিনিধি একজন সহায় সম্বলহীন অসহায় কৃষক অভয়। তাকে কেন্দ্র করেই সামগ্রিক রোমন্থন বর্ণিত হয়েছে। এই অভয়দের জীবন বর্ণনায় লেখক সমস্ত পূর্বসূরীদের অভিজ্ঞতার জগৎকে অতিক্রম করেছেন। এইসব মানুষদের দেখার মধ্যে কোনো কল্পনা বিলাসী মন কিংবা ভাববিলাসী চিন্তা নেই। এ একেবারে সাদা চোখে দেখা। রঙীন চশমা খুলে ফেলে সরাসরি দেখা বলতে যা বোঝায়। অভয়রা জীবন ধারণের সমস্ত মানবিক উপাদান হারিয়ে কোনো রকমে বেঁচে আছে। লেখক অভয়দের জীবনে 'হাসি'র ব্যাখ্যা করেছেন অত্যন্ত নিপুণ ভাবে—''অভয়ের পিতা অঘোর প্রথম বয়সে হাসিয়া

ছিল, তাহাকে হাসি বলা যায়। ... সে হাসি তার প্রৌঢ়াবস্থায় বক্র হইয়া উঠিয়াছিল। হাসির শৈশব আছে, যৌবন আছে বার্দ্ধক্য আছে; কিন্তু হাসি যখন অসহায় হইয়া আতঙ্কে বাঁকিয়া চুরিয়া দেখা দেয়, হাসির তখন মুমুর্ষু অবস্থা, অঙ্গুরীর মত চতুর্দিকে নিরন্ধ্র কারায় বেষ্টন করিয়া অন্ধকার যখন দীপশিখাটিকে বায়ুর তীর মারিয়া মুহুর্মুহু; আঘাত করিতে থাকে, এ হাসি তখনকার সেই দীপশিখাটির মত, মৃত্যুর দিকে চলিয়াছে।"[২৮] চণ্ডীমঙ্গলের ভাঁড়ুদত্তের উত্তরসূরীর মতো ঠকবাজ কালোশশী পাটের দামে অভয়কে ঠকায়। ভাঁড়ু যেমন রাজা কালকেতুকে সন্তুষ্ট করার নানা ফন্দি আঁটতো এই কালোশশীও তেমনি। বাবুদের আগমনে সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। নিজে যেচে এসে বাবুদের অভ্যর্থনার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে। ফলে গ্রাম সমাজ ত্রিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে—যার এদিকে বাবুরা, মাঝে কালোশশীর মতো সুবিধাবাদী আর অন্যদিকে অভয়ের মতো ছিন্নমূল মানুষ। এই ত্রয়ী-সম্প্রদায় সম্পর্কে সমালোচক ড. সরকার আবদুল মান্নান লিখেছেন—''বাবুদের বিশ্রাম আছে, নিশ্চিন্ততা আছে, অস্তিত্বকে নানাদিকে বিলিয়ে দেয়ার অবকাশ আছে। কালোশশীরও আছে। কিন্তু অভয়দের তা নেই। বাবুদের সঙ্গে তার এই ঐক্য এবং অভয়দের সঙ্গে এই স্বাতন্ত্র্য বুঝিয়ে দেয়ার জন্য কালোশশী চৈতন্যের কোনো এক গোপন ইন্ধনে বাবুদের অভ্যর্থনা দেয়ার জন্য মেতে ওঠে।"[২৯] আসলে গ্রামীণ মানুষের দারিদ্র্যের বর্ণনা করা লেখকের উদ্দেশ্য নয়, তিনি মানুষগুলোর অন্তরের অন্ধকার জগতে প্রবেশ করে তুলে এনেছেন একের পর এক অবাক করা চিত্র।

'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র পল্লীবাংলার বর্তমান অবক্ষয়ের কালে দাঁড়িয়ে এর যে একটি সোনালী অতীত ছিল সেকথাও স্মরণ করেছেন এবং শেষে শাসক শ্রেণীর মানসিকতার পরিবর্তন আর জ্ঞানের আলো জ্বালানোর মাধ্যমে মুক্তির পথ অনুসন্ধান করেছিলেন। 'পল্লীসমাজ' থেকে 'রোমন্থন' মাত্র দেড় দশকের ব্যবধান। জগদীশবাবুও অভয়ের স্মৃতিচারণায় খুঁজেছেন সেই হারানো পল্লীকে—''সে ঝাউবন নাই—অভয়ের মনে হইল পল্লীর ক্রোড় নিঃস্ব করিয়া যত কিছু সামগ্রী একে একে বিচ্যুত হইয়া গেছে তাহাদের সকলের বড় বাল্যকালের সেই ঝাউবনটি।"[৩০] স্মৃতিগুলো এভাবেই আসে, তবে তারা একেবারেই নির্জীব বাহু বাড়াইয়া আলিঙ্গন করিতে চায়—প্রেতমূর্ত্তির সে মূক মুখে তার ভাষা নাই—মনকে সে বিচলিত করে না।' অথচ একসময় কত ইচ্ছা ছিল। সেসব কল্পলোক এখন অন্ধকার, অচঞ্চল। সেইসব স্মৃতিশক্তির আজ আর কোনো মূল্য নেই। মৃতের আত্মা, যেমন দূর থেকে পরিত্যক্ত

দেহটাকে দেখে তেমনি নিরর্থক দৃষ্টি নিয়ে মাঝে মাঝে স্মৃতির জগতে মন ছুটে চলে। মনে হয় সেইসব দিন যদি আবার ফিরে আসে। কিন্তু বত্রিশ বছর বয়স্ক অভয়ের কাছে এশুধুই স্মৃতিমাত্র। 'এই বয়সেই সে পুরাতন জগতের দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে।' ভাঙনের স্মৃতির পারে দাঁড়িয়ে অভয়ের সমান্তরালে মূল্যবোধশূন্য নৈতিকতা বিহীন কালেশশীর উদ্দেশ্যে বড়বাবু আশ্বাস বাণী দিয়ে জানিয়েছেন—

■ ''পল্লী ছাড়া কি আমাদের গত্যন্তর আছে? ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে আমরা খুব ভাবছি; আর চাষের কথাও আমাদের সভায় মাঝে মাঝে আলোচিত হয়—বিশেষজ্ঞ আছেন। খবরের কাগজে দেখে থাকবে।''[৩১]

■ ''... ম্যালেরিয়া আর গোচারণ ভূমিই আমাদের প্রথম লক্ষ্য হবে। একটিকে তাড়াব, আর একটিকে তৈরী করব। জিজ্ঞাসা করবে, কেমন ক'রে তৈরী করব? ফসলের জমি যদি ফসল বেশী দেয়, ঢের বেশী, তবে লোকে খানিকটা জমি গরুর জন্যে উদ্ধৃত ক'রে রেখে দিতে অক্লেশেই পারবে। ভূমিকে উর্ব্বরা করে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।''[৩২]

বাবুদের এই জাতীয় মানসিকতার ফলে শহরের মানুষের মধ্যে গ্রামের মানুষ সম্পর্কে দেখা দিয়েছে একদিকে ঘৃণা, উন্নাসিকতা ও অবিশ্বাস; অন্যদিকে পল্লী প্রকৃতি সম্পর্কে রূপময়ী সৌন্দর্য লক্ষ্মীরূপে রোমান্টিক কল্পনা। এই দুটি ধারণাই তাঁদের অনভিজ্ঞতাজাত আর নিছক কল্পনা প্রসূত। এই জাতীয় মানসিকতার মানুষদের লেখক তীব্র ভাষায় ধিক্কার জানিয়েছেন। শরৎচন্দ্র যেখানে একটা কাল্পনিক ভাবনা পথে গ্রাম সমাজের উত্তরণের কথা বলেছেন সেখানে তাঁরই প্রতিভার মানসপুত্র জগদীশবাবু গ্রাম বাংলার নৈতিক অবক্ষয় আর অর্থনৈতিক দুর্দশার কারণটি অনুসন্ধান করে তার প্রকৃত রূপটিকে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের বড়বাবু হিসেবী, বুদ্ধিমান, সংযমী। মেজবাবু স্পষ্ট বক্তা আর ছোটবাবু বিলাসী, দার্শনিক, প্রকৃতি প্রেমিক। এদের হাতে পড়ে গ্রাম বাংলার উত্তরণ যে একটি বড় প্রশ্ন চিহ্নের সম্মুখীন সেকথা লেখক স্পষ্টভাবে জানাতে দ্বিধা করেননি।

'রোমন্থন' উপন্যাসেরই ভিন্ন পিঠ হিসেবে 'দুলালের দোলা' উপন্যাসেও বাংলাদেশের গ্রাম সমাজের এক স্বতন্ত্র প্রতিফলন ঘটেছে। উপন্যাসটির বিচ্ছিন্ন কাহিনীর তিনটি অংশ। 'ঘটনাগুলিও পরস্পর বিচ্ছিন্ন, কিন্তু একস্থানে যাইয়া ফল প্রসব করিতেছে'। অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতার মাঝেও একটা যোগসূত্র অন্বেষণ। সেইসূত্রে লেখকের মূল বক্তব্য হল, বাংলাদেশের সমাজ,

বিশেষ করে পল্লী বাংলার ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের জাত্যাভিমানের অর্থহীনতা আর গৌরব দাবীর অসারতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা। উপন্যাসের তিনটি পৃথক অংশের প্রথমটি পশ্চিম প্রবাসী নীরদবরণের তিক্ত অভিজ্ঞতা আর অন্য দুটি গ্রামস্থ বৃদ্ধ পিরুর মুখ দিয়ে বলা ঘটনার কোলাজ। প্রবাসী নীরদবরণের ঠাকুরদার গ্রামের বাড়ীতে বেড়াতে আসা উপলক্ষে তার পিসিমার ভাবনাভিব্যক্তি প্রকাশ সম্পর্কে উপন্যাসের সূচনাতেই লেখক নীরদবরণের জবানীতে জানিয়েছেন—''পিসিমা অনেকেরই আছেন; কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেখিয়া কোনো পিসিমাই বোধকরি এমন করিয়া কাঁদেন না। কিন্তু আমার পিসিমার আমাকে দেখিয়া পুলকাশ্রু মোচন করিবার কারণ আছে। ... দেশের অধিকাংশ লোকের মত আমাদেরও নিবাস পল্লীগ্রামে। পল্লীগ্রামে বাস বলিয়াই আমরা নিতান্ত তারা কাটা আর একঘেয়ে জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছি ইহা সত্য নহে।''[৩৩]

এইভাবে নীরদবরণের চোখ দিয়ে লেখক গ্রাম জীবনের পরিচয় তুলে ধরেছেন। পিসিমার কাছে এসে নীরদবরণ গ্রাম দেশের মুক্ত প্রকৃতির অনাবিল রূপ উপভোগ করেছে। গ্রামের পথে বেরিয়ে প্রকৃতি তার কাছে মুক্তবেণী ছড়ানো চুলের দূরন্ত কিশোরীর মত ধরা দিয়েছে। এ যেন জন-অরণ্য কলকাতা থেকে পদ্মালালিত ভূ-খণ্ডে গিয়ে তরুণ রবীন্দ্রনাথের পদ্মা-প্রকৃতির রূপ আস্বাদন। নীরদবরণের চোখে দেখা প্রকৃতির কিছুটা অংশ এরকম—''রৌদ্র আর ছায়ার অমন সমাবেশ আমি কল্পনা করিতে পারিতাম না। ছায়া রৌদ্র ক্ষেত্র রচনা করে নাই, একটি সন্ধিস্থলে তাহারা সম্মিলিত হয় নাই—কালো জমির উপর কে যেন রোদে ফুল কাটিয়াছে। ... চঞ্চল আলোকখচিত স্থির ছায়া মণিদীপ্ত অন্ধকারের মত প্রসারিত হইয়া আছে এবং এই অপরূপ ভজনালয়ে পাখীর দিবাবন্দনা তখনও শেষ হয় নাই; দিনোদয়ের পুলকে পাখী তখনও মুক্ত কণ্ঠ!''[৩৪]

অনাবিল নির্মল এই প্রকৃতিই বাংলার জীবনের একমাত্র সম্পদ নয় এবং লেখক সেই দিকটিতেও অধিক আলোকপাত করেননি। বরং এই আলোকমালার বিপরীত যে অন্ধকার মানব জগত রয়েছে নীরদবরণের অভিজ্ঞতার নিরীখে লেখক সেই দিকেই বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। নীরদবরণ দেখেছে ধর্ম-বর্ণের ভেদে পীড়িত গ্রাম জীবনের ক্লেদাক্ত রূপ; অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ গ্রামীণ মানুষের অশ্লীল রসিকতা আর অশ্রাব্য গানের নির্লজ্জ পরিবেশ। এসব তিক্ত অভিজ্ঞতা নীরদবরণকে হতাশ করেছে। ব্রাহ্মণ্য প্রধান গ্রাম জীবনের এক বীভৎস রূপ সে

প্রত্যক্ষ করেছিল নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে। তাকে কেন্দ্র করেই যে ভোজের আয়োজন সেখানে তাকে বাদ দিয়ে অন্যদের পূর্বে পরিবেশন করা হচ্ছিল। এর কারণ সহজেই পরিস্কার হয়ে যায় নীরদবরণের কাছে। ব্রাহ্মণ ভোক্তাকে বাদ দিয়ে তার মতো অব্রাহ্মণকে কোনো অবস্থাতেই আগে খেতে দেওয়া হবে না। শুধু তাই নয় খাবার পর তাকে নিজের এঁটো থালা নিজেকেই মেজে আসতে হয়েছে। এরপর গ্রামের অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ দ্বারিক ঠাকুরের প্রসাদ পাবার নিমন্ত্রণ নীরদ প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে জানিয়েছে—''আগে মানুষ, তারপর ভদ্র-অভদ্র, সকলের শেষে ব্রাহ্মণ-শূদ্র। সংস্কার আগে নয়, গুণ আগে—আপনাদের কথাটা মনে করিয়ে দেবার সময় এসেছে। আপনি আমাকে দিয়ে এঁটো বাসন মাজাতেন কিনা জানি নে, আপনি তা' করাবেন না' প্রতিশ্রুতি দিলেও আমি ব্রাহ্মণ বাড়ীতে খেতে যাব না।''[৩৫] নীরদবরণের এই অকপট সত্য-কথনের ফল ভালো হয়নি। পরদিন পরিধেয় বস্ত্রাদি ছাড়া নীরদের সমস্ত কিছু চুরি হয়ে যায়। 'বালক, তুমি ব্রাহ্মণকে চেন না'। বস্তুত দু'শো সিঁদেল চোরের সর্দার ব্রাহ্মণ দ্বারিক ঠাকুরকে চিনতে পারেনি নীরদবরণ। এইভাবে ব্রাহ্মণ প্রধান গ্রাম সমাজের সংস্কার ঘেরা মৌচাকে জগদীশবাবুও প্রথম অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে ঢিল ছুঁড়ে ছিলেন।

উপন্যাসের অন্য দুটি ঘটনার বর্ণনা করেছে বৃদ্ধ পিরু। এই পিরু হলেন নীরদবরণের ঠাকুরদার বাল্যসঙ্গী। পিরু শুধু গ্রাম সমাজের নগ্ন চিত্রই বর্ণনা করেননি, সেই সঙ্গে তিনি গ্রামের 'পোড়া বৌ' নামকরণেরও কালো ইতিহাস বিবৃত করেছেন। লেখকের 'কলঙ্কিত সম্পর্ক' (১৯৬০) উপন্যাসের নায়ক সাতকড়ি নারীঘটিত অপরাধ করেও সমাজের চোখে দোষী সাব্যস্ত হয়নি। বরং তাকে গ্রহণ করতে না পাবার জন্যে স্ত্রী মাখনকে সমাজপতির ভূমিকা নিয়ে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে শাশুড়ি। এখানেও সেইরকম ঘটনারই প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। স্বামী ভারতের কৃতকর্মের দায় মাথায় নিয়ে অন্তঃস্বত্বা যোগীশ্বরী দরজায় খিল এঁটে দিয়ে নিজের কাপড়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। বাড়ি ভর্তি লোক কেউই খেয়াল করেনি। আগুন কিছুক্ষণ জ্বলার পর ঘরের ভিতর থেকে ধোঁয়া আর ধোঁয়ার সঙ্গে মানুষ পোড়ার দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে দেখে সকলে যখন দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকে ততক্ষণে সবশেষ। সেই থেকে গ্রামের নাম হয়ে যায় 'পোড়া বৌ'। এইরকম এক মর্মান্তিক কাহিনী শুনিয়ে পিরু তার ছোট মনিব নীরদবরণের কাছে নারী পুরুষের সম্পর্কের প্রধান লক্ষ্য যে স্থূল জৈবিকতা সেটাও ব্যক্ত করতে ভোলেনি। তার কথায়—''আমি ভেবে দেখেছি, বাবু ধম্মপত্নী, স'ধম্মিনী, আরো অনেক কথার এম্‌নি

মানে নাই। মন্তর মেয়েকে বাঁধার কৌশল, তার দেহটাই আসল।"[৩৬] উপন্যাসের তিনটি কাহিনীর মধ্যে লেখকের একটি অভিপ্রায় লক্ষ্য করা যায়—তা হল বর্ণাভিমানের অসারতা দেখানো। এর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। তবে জগদীশবাবুর দৃষ্টিভঙ্গিগত উগ্রতা শরৎচন্দ্রে পাওয়া যায় না। এখানেই তিনি তাঁর 'মানসপিতা'কে অতিক্রম করে গেছেন।

'রোমন্থন' এবং 'দুলালের দোলা' —এই দুটি উপন্যাসের সমাজ জীবন ভাবনা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে 'যথাক্রমে'র সঙ্গে মিলিত হবার মধ্যদিয়ে। তৃতীয় উপন্যাসটিতেও লেখক অত্যন্ত নির্মোহ দৃষ্টি দিয়ে গ্রাম সমাজের নগ্ন বাস্তবতাকে তুলে এনেছেন। উপন্যাসটিতে রয়েছে দুটি সমান্তরাল কাহিনী একটির কেন্দ্রে আছে দীনবন্ধু ও সাবিত্রী নামক ভাই ও বোন এবং অন্যটি নিত্যপদ ডাক্তারকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। দুটি কাহিনীর মধ্যদিয়ে লেখক গ্রাম সমাজ সম্পর্কে সনাতন ধারণাগুলি ভেঙ্গে দিয়ে একটি বাস্তব ও নির্মম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন তাঁর পাঠকদের। উপন্যাসটির শুরুতেই লেখক পল্লীগ্রামের সঙ্গে তাঁর পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে লিখেছেন—''ছোট্ট নদীর ধারে হাট। গ্রামের নাম বেতডাঙ্গা, নদীর নাম চন্ননা, হাটের নাম চন্ননার হাট। নদীর বুক বৃদ্ধার স্তনের মত শুকাইয়া আসিতেছে, তবু স্তন্যের মায়ামধু কৃতজ্ঞ স্তন্যপায়ী সন্তানেরা ভুলিতে পারে না, চন্ননাকে ভাল বাসিয়া হাটের নাম দিয়াছে চন্ননার হাট।"[৩৭] কেবলমাত্র চন্ননা নদী নয়, এখানকার সবই ছোট—গ্রাম ছোট, হাট ছোট, হাটে যারা আসে তারাও ছোট। দোকানগুলি সর্বব্যাপী ছোট'র মাঝে ছায়াবাসী বৃক্ষ শিশুর মত খর্ব হয়ে আছে। সব মিলিয়ে বেতডাঙ্গা গ্রামটি উপন্যাসে একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে। এই চরিত্রটির ভেতরে আবার দুটি পৃথক গল্প। একটি মুদির দোকানের মালিক রামপ্রসাদ ও তার ছেলেমেয়েকে ঘিরে; অন্যটি ফণী ডাক্তার ও নিত্যপদ ডাক্তারের গল্প। প্রথম গল্পে আমরা দেখি ছেলেমেয়েদের ছোট রেখে রামপ্রসাদ মারা গেলে শ্রীমন্ত ঠাকুরের সহায়তায় তার ছেলে দীনবন্ধুর অবর্ণনীয় জীবন অভিজ্ঞতা যেমন বর্ণিত হয়েছে, তেমনি বিয়ের পর সাবিত্রীর শ্বশুর বাড়ীতে তার নিয়মিত দৈহিক ও মানসিক পীড়ন এবং সেইসূত্রে গ্রামীণ মানুষের নীচতা ও সংকীর্ণতা পরিস্ফুট হয়েছে। গ্রামীণ মানুষের জাতপাত ধর্মীয় বিভেদের লড়াই যেমন আছে তেমনি লেখক চরিত্রগুলির মনোলোকের কুৎসিত দিকটিকে পরিস্ফুট করেছেন। গ্রামের হাটে মতিলালের বানর আনাকে কেন্দ্র করে হাটে আগত মানুষগুলো

হিন্দু-মুসলমানে ভাগ হয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়েছিল। এই বিবাদ রক্তারক্তি পর্যায়ে প্রায় পৌঁছেছিল, কিন্তু শ্রীমন্তের মধ্যস্থতায় তা মাঝপথেই থেমে গিয়েছিল। আবার পিতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের রমেশের মতোই দীনবন্ধু অনুধাবন করতে পেরেছিল গ্রামীণ মানুষগুলোর নীচতা ও স্বার্থপরতা। দোকানে বাকী নিয়ে ধার শোধ না দেওয়া থেকে শুরু করে সংসার বিষয়ে অনভিজ্ঞ দীনবন্ধুকে নানাভাবে ঠকানোর চেষ্টা মানুষগুলো করেছে। পিতার মৃত্যুর পরে পরেই দীনবন্ধু সংসারের মানুষগুলোর প্রকৃত স্বরূপ বুঝে গিয়েছিল—"... দীনুদের এই দুর্দ্দিনে তাহাদের শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া সবাই সৎপরামর্শ দিল যত, তাহাদের আগ্‌লাইবার কেহ নাই দেখিয়া ফাঁকি দিল তার ঢের বেশী। তাহাদের প্রাপ্য পয়সা আগ বাড়াইয়া কেহ দিতে আসিল না। খাতায় হিসাব উঠিত না; অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সজ্ঞান অপরাধের সাজা কঠিনতর জানিয়াও রামপ্রসাদের এই কাঁচা কাজের সুযোগ ত্যাগ করিলেন না।"[৩৮]

'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে মায়ের মৃত্যুর পর কাঙালী যেমন ঘন্টা দুয়েকের অভিজ্ঞতায় সংসারে বুড়ো হয়ে গিয়েছিল তেমনি দীনবন্ধুও ধীরে ধীরে ঠকতে ঠকতে পাকা ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছে অল্পকালের মধ্যেই। বোন সাবিত্রীকে সে ভিন গাঁয়ে বিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সাবিত্রীর শ্বশুরবাড়ীতে বিশেষ করে শাশুড়ি ও দেবরদের অত্যাচার বাংলাদেশের প্রায় ঘরে ঘরে পুত্রবধূ নির্যাতনের ভয়ংকর দৃশ্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা' কিংবা 'হৈমন্তী' গল্পে যেভাবে অত্যাচারিতা গৃহবধূ ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেছে এখানে তার বিপরীত অবস্থাকেই লেখক তুলে ধরেছেন। গৃহবধূ সাবিত্রী অত্যাচারিতা হতে হতে একসময় রুখে দাঁড়ায় এবং সংসারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অত্যাচারিতার এই ঘুরে দাঁড়ানোর মধ্যদিয়ে জগদীশবাবুর ভাবনার স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত হয়ে গেছে।

'পল্লী সমাজে'র রমেশ কিংবা 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র শশীভূষণ যেভাবে গ্রামীণ মানুষের সেবা করতে গিয়ে নানাভাবে উৎসাহের ভগ্ন তীর ধরে পেছন দিকে ফিরে আসতে শুরু করেছিল, এই উপন্যাসের ডাক্তার নিত্যপদর অবস্থাও তদনুরূপ। রমেশকে শেষ পর্যন্ত একটা কল্পিত আদর্শ সমাজের শীর্ষদেশে স্থাপন করেছিলেন শরৎচন্দ্র কিংবা শশী যেমন কবিরাজ যাদবের রেখে যাওয়া অর্থ দিয়ে গ্রামে হাসপাতাল গড়ার মধ্যদিয়ে উত্তরণের পথ খুঁজে পেয়েছিল, কিন্তু নিত্যপদ তেমন পথের দিশা পায় নি। ফলে পল্লী সমাজের মানসিকতা পরিবর্তনের কাল্পনিক পথ ছেড়ে লেখক নিত্যপদকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন নগ্ন বাস্তব মৃত্তিকার

ওপর। প্রথম দিকে অবশ্য তার মধ্যে রমেশের মতোই সুন্দর সমাজ গঠনের স্বপ্ন ছিল। তার সেই ভাবনা ব্যক্ত করে লেখক জানিয়েছেন—''নিত্যপদ মোহিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, লক্ষ্মী যে বৈকুণ্ঠবাসিনী তাহার প্রমাণ আমাদের পল্লী প্রকৃতি আর পল্লীবাসীর প্রকৃতি।... বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষ্মীর এই কমনীয় অঞ্চলতল আশ্রয় করিয়া নিত্যপদ কায়েমী হইয়া বসিল।''[৩৯] কিন্তু নিত্যপদ'র স্বপ্নাচ্ছন্নতা খুব দ্রুত ভেঙ্গে যায় রমেশের মতোই। পল্লীবাসীর প্রকৃত স্বরূপ তার কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়। গ্রামের স্বার্থান্ধ মানুষের সঙ্গে তার সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। গ্রামের প্রধান নিত্যপদর উদারতাকে সুকৌশলে ব্যবহার করতে থাকে। হাতুড়ে ফণী ডাক্তার ও গ্রাম পঞ্চায়েত মতিলাল যৌথভাবে নিত্যপদর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। নিজে রং মেশানো ওষুধ দিয়ে মানুষকে ঠকায় ফণী, কিন্তু নিত্যপদ মানুষের কাছে বিনা পয়সায় ওষুধ পৌঁছে দেয়। যাদের ওষুধের দাম দেবার সামর্থ নেই তারা পর্যন্ত মতিলাল আর ফণীর প্ররোচনায় পা দেয়। গ্রামের সকল স্তরের মানুষ সম্মিলিতভাবে ষড়যন্ত্র করে নিত্যপদর জীবন যখন দুর্বিষহ করে তুলেছে, তখন সেই চক্রব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে ফণী ডাক্তারের কৌশলকেই সঠিক বলে মনে করেছে নিত্যপদ। সহকারী কান্তিভূষণকে সে নির্দেশ দিয়েছে—''তোমার খুব ক্ষতি হল, কান্তি; তুমি শিখতে এসেছিলে, কিন্তু তা হ'ল না। ... আর ওষুধ বিতরণ করে' কাজ নাই। জল দিতে থাকো। ফণীবাবু দেশের লোকের নাড়ী ধরে আছেন—তাঁর ব্যবহারই ঠিক। আমরা ভুল পথে চলেছিলাম, ভাই।''[৪০]

শরৎচন্দ্রের 'মানসপুত্র' জগদীশবাবু তাঁর কথাসাহিত্যে যে প্রথা বিরোধী জীবন তৃষ্ণাকে বাহন করেছেন, এই কাহিনীতেও তার কোনো ব্যত্যয় ঘটে নি। তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, বাইরে থেকে পল্লী প্রকৃতি ও পল্লীবাসীকে যতই শান্ত ও সুস্থির মনে হোক না কেন, তার ভেতরটা মাকাল ফলের অনুরূপ। এর প্রতিটি স্তরেই রয়েছে পরশ্রীকাতরতা, স্বার্থপরতা, দারিদ্র্যের কশাঘাত, কুৎসা রটানোর মধ্যদিয়ে প্রবল আনন্দ ভোগ। উপন্যাসের দীনবন্ধু, সাবিত্রী, নিত্যপদ এরা প্রত্যেকেই সেই অবস্থাগুলোর সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে এবং বিরূপ সমাজের সঙ্গে লড়াই করতে করতে তারা শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকেই তাদের মতো করেই টিকে গেছে। ড. প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় উপন্যাসটি সম্পর্কে লিখেছেন—''জগদীশগুপ্তের দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল মূলতঃ নৈরাশ্য পীড়িত। তাঁর দৃষ্টিতে জগৎ সংসার অপরিশোধ্য পঙ্কিলতার ঘন অন্ধকারে নিমজ্জিত। এই সর্বগ্রাসী অন্ধকারের মধ্যে দু'একটি ক্ষীণ আলোকবর্তিকা যদিও

কখনও দৃষ্ট হয়, পারিপার্শ্বিকতার চাপে তা স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না। এই হল তাঁর জীবনদর্শন। যথাক্রমের মধ্যেও সেটা দেখাতে চেয়েছেন।"[৪১]

গ্রাম সমাজজীবনকেন্দ্রিক 'ত্রয়ী' উপন্যাস ছাড়াও জগদীশবাবুর 'অসাধু সিদ্ধার্থ' 'গতিহারা জাহ্নবী', 'লঘুগুরু' 'নন্দ আর কৃষ্ণা' প্রভৃতি উপন্যাসে সমাজের কদর্য দিকটি উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে। 'অসাধু সিদ্ধার্থে'র নটবর ওরফে সিদ্ধার্থের কদর্য জীবন কাহিনী বর্ণনার মধ্যদিয়ে লেখক ক্ষয়ে যাওয়া মূল্যবোধের ফসিল একটা সময়কে তুলে এনেছেন। প্রচলিত সমাজ ধারায় সিদ্ধার্থের মতোই একেবারে কদর্য মানব রূপ প্রত্যক্ষ করি 'গতিহারা জাহ্নবী'র নায়ক 'অপদার্থ অকিঞ্চনে'র মধ্যেও—যার ভেতর কোনরকম শুভবোধের পরিচয় পাওয়া যায় না। নিজের স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও যে অনায়াসেই স্ত্রীর 'সখী'র প্রতি লালায়িত হয় এবং 'বাবু' শ্রেণীর মতোই বে-পাড়ার নারীদের সঙ্গে কদর্য জীবনে মেতে উঠতেও দ্বিধা করেনি। আবার 'নন্দ ও কৃষ্ণা' উপন্যাসে মণীন্দ্রবাবু তার রক্ষিতা নিয়ে এক দুর্বিষহ জীবন শুধু যাপন করেনি, প্রকারান্তরে নন্দকেও ঠেলে দেওয়ার অবকাশ রচনা করেছে নিজে গৃহে অনুপস্থিত থেকে। রক্ষিতাকে নিয়ে সংসারে জীবনযাপনের কারণে সমাজ কখনোই মণীন্দ্রবাবুর ওপর অভিযোগের আঙুল তোলে নি। অথচ 'নিষেধের পটভূমিকায়' অভয়া তার মেয়েকে নিয়ে অতুলের সঙ্গে গৃহত্যাগ করলে সমাজ শুধু অভয়াকেই অভিযুক্ত করেনি, অতুলের প্রকৃত পরিচয় জানতে পেরে শান্তি যখন তার আসল পিতার কাছে গেছে, তখনও তার পিতা সাংসারিক নিরাপত্তা আর সমাজের রক্তচক্ষুর ভয়ে কুলত্যাগিনী স্ত্রীর কন্যাকে গ্রহণ করতে চায়নি। অসহায় শান্তির জীবনে ক্ষণপ্রভাব মতো প্রত্যাশা জাগিয়ে ছিলেন তার গুরুজী ত্রিদিব। ত্রিদিব তার এক ধনী বন্ধু নিস্তারণ মজুমদারকে শান্তির আশ্রয়হীনতার কথা জানালে নিস্তারণ শান্তিকে পুত্রবধূ করে ঘরে তুলে নিল। যে পিতা আপন সন্তানকে পুনঃরায় গ্রহণ করে পরিচয় দিতে চায়নি, সেই বসন্ত এসেই যদিও কন্যা সম্প্রদান করেছে। এখানে নিস্তারণ মজুমদারের ভূমিকাটি জগদীশবাবুর ভাবনা প্রবাহের অনুবর্তী হয়নি। লেখক নিজেই যেন নিস্তারণের ভূমিকা নিয়ে শান্তিকে বলেছেন—''গভীরতম পঙ্কের খবর জানি, পর্ব্বত শিখরের খবরও জানি; পৃথিবীর এক পাই লোক বাদে সবারই চরিত্র, নীতি, অর্থ, মন, বৃত্তি, আশা কলুষিত। তা'রা তা' স্বীকার করে, সবাই তা' জানে তা-ও তা'রা জানে, এবং আনন্দ করে—তাদের প্রসারের অন্ত নেই। আর তুমি স্বয়ং কায়মনোবাক্যে নিষ্কলুষ হ'য়ে বলছ, নিজেকে প্রসারিত করবার স্থান তোমার

নেই।”[৪২] একরম ত্রুটি বিচ্যুতিটুকু বাদ দিলে জগদীশবাবু তাঁর সমাজ ভাবনার আদর্শেরই প্রতিফলন এখানেও ঘটিয়েছেন।

লেখকের একেবারে নিজস্ব সমাজ চিন্তার ফসল তাঁর ‘লঘুগুরু’ উপন্যাসটি। এই উপন্যাসে লেখক গণিকা নারীর জীবনের ট্রাজেডিকে তুলে এনেছেন অত্যন্ত নির্মোহ ভঙ্গীতে। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শরৎচন্দ্র—এমন গণিকা নারীর গল্প কাহিনী উপন্যাসে যতটা পরিবেশিত হয়েছিল সেসব ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রে নীতিবাগীশ চিন্তা দ্বারা আক্রান্ত। এই নীতিবাগীশতার মূল্য দিতে হয়েছিল বাংলা উপন্যাসের প্রথম উল্লেখযোগ্য স্বৈরিণী নারী ‘কৃষ্ণকান্তের উইলের’ রোহিণীর। গোবিন্দলালের পিস্তলের গুলিতে রোহিণীকে মরতে হল। অথচ সমাজ গোবিন্দলাল কিংবা বিষবৃক্ষের নগেন্দ্রনাথের জন্য কোনো শাস্তি বিধান করেনি। যেন বিধবার কারণেই সমাজটা রসাতলে যেতে বসেছিল। বঙ্কিম এমন একটি ভাবনা থেকেই শিল্পীসত্তাকে টুটি চেপে ধরে নীতিবাদী সত্তাকে মুখ্য করে দিয়ে খড়্গাঘাত নামিয়ে এনেছিলেন। এরপর শরৎচন্দ্রের ‘শ্রীকান্তে’র রাজলক্ষ্মী কিংবা ‘চরিত্রহীনে’র সাবিত্রী চরিত্রের মধ্যে যে গণিকা সত্তাটুকু প্রত্যক্ষ করেছিলেন সেসব গৌণ হয়ে গিয়ে তাদের ভেতরের সতী নারী সত্তাকেই লেখক মুখ্য করে তুলেছেন। ফলে বাঈজী রাজলক্ষ্মী কিংবা মেসের ঝি সাবিত্রী মহীয়সী নারীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। ফলে বঙ্কিমী নীতিবাগীশতা, রাবীন্দ্রিক রোমান্টিকতা আর শরৎচন্দ্রের জ্যোৎস্নার আবেগ বিহ্বলতা অতিক্রম করে বাংলায় প্রথম যথার্থ শিল্পী মনোচিত নিরাসক্তি আর অনাবিলতায় ঋদ্ধ গণিকা চরিত্র নিঃসন্দেহে ‘লঘুগুরু’র উত্তম ও সুন্দরী। আর উত্তমের করুণ পরিণতি ঘটেছে টুকীর পাপের পথে নেমে যাওয়ার মধ্যদিয়ে। উপন্যাসে উত্তম থেকে টুকী—গণিকা নারীর জীবন যন্ত্রণাকে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। এরই সাথে সুন্দরী নাম্নী রক্ষিতা নারীর কদর্য জীবন, আর ‘স্বভাবসিদ্ধ ইতর’ বিশ্বম্ভর এবং ‘কোমর বাঁধা শয়তান’ পরিতোষের কদর্য জীবনকে লেখক তুলে ধরেছেন। এইসব সমাজ মানুষের জীবন বর্ণনায় লেখক একেবারে স্বতন্ত্র চিন্তার পরিচয় রেখেছেন। এক সময়ের গণিকা উত্তম তার অতীতের যাবতীয় কদর্য-পঙ্কিল জীবন ছেড়ে প্রতিষ্ঠা পেতে চেয়েছে সংসারের গৃহী নারীর মতো গৃহস্থের গৃহান্তরালে। লেখক সেই উত্তমের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন—“... মানুষকে হাতে পাইয়া তাহাকে বশীভূত করিয়া খেলাইয়া খেলাইয়া পিশাচ করিয়া তুলিবার বিদ্যাটা সে চেষ্টা করিয়া ভিতরকার বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া শিক্ষা করিয়াছিল—তখন তার নাম ছিল

বনমালা—তারও আগের নাম যূথী। মানুষ সেই যূথীর শত্রু। কিন্তু যেদিন ঐ কাজে দুরন্ত ঘৃণা ধরিয়া গেল, আর যেদিন বিশ্বম্ভরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল ঐ দুদিনের ব্যবধান খুব অল্প তার হিংস্র পুরুষ বুভুক্ষা লুপ্ত হইয়া তখন পুরাতন গৃহ বুভুক্ষা জাগরিত হইয়াছে।"[৪৩]

সমাজের সঙ্গে নারী চরিত্রের তিনটি প্রবণতার সংগ্রাম ও পরিণতি উপন্যাসে দেখানো হয়েছে।

- নারী স্বভাবের অন্তরীণ গৃহবুভুক্ষা ও প্রেম প্রত্যাশাকারী নারী উত্তম।
- নারী স্বভাবের অপরিমেয় পুরুষবুভুক্ষা ও অর্থলোলুপতা—সুন্দরী। এবং
- নারীর স্বৈরিণী যাপনে বাধ্যকতা—মূলত সমাজের চাপেই তার এই পাপের পথে নেমে যাওয়া—টুকী।

বাস্তব সম্মত বর্ণনার দ্বারা, যা নিছক সাংবাদিকতা নয়, কাহিনীর রূপায়ণে জগদীশগুপ্ত সমাজের পচনশীলতা আর ছিন্ন মানবতাকে তুলে ধরেছেন উপন্যাসে। এই বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক তাঁর সংযমী মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। পাপের পথ ছেড়ে সুস্থ স্বাভাবিকতায় ফেরা উত্তমের অকলুষিত নারীত্বের পরিচিতির অবশ্য প্রয়োজনেই লেখক জানিয়েছেন—"... তার সদ্যস্নাত মুখমণ্ডলের উপর হইতে জল আর আলোর ইন্দ্রজাল তখনো একেবারে মুছিয়া যায় নাই। সিক্ত কেশ কাপড়ের উপর দিয়া পিঠের উপর ছড়াইয়া আছে, চোখের পাতা তখনো ভেজা, তাহাতে তাহাকে বিষন্ন দেখাইতেছে। গোটা কতক জড়ানো চুল ভুরুর উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

অতিশয় সংযত পবিত্র মূর্ত্তি; পরিচয় না দিলে এ যে কি তাহা বুঝিবার যো নাই।"[৪৪] এ হেন গণিকার বদলে যাওয়া জীবন, সংসারে এসে ঘরে বাইরের মানুষের দ্বারা সমালোচিত বিদ্ধ হয়ে বারবার ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। তারই হাতে লালিত-পালিত টুকীর বারবার বিয়ে ভেঙে গেছে। সমাজ-মানুষের অদৃশ্য অঙ্গুলি হেলনে একটি সম্ভাবনাময় সুন্দর জীবনের ঠিকানা হয়েছে রক্ষিতা পরিবৃত পঞ্চাশোর্ধ বিপত্নীক পরিতোষের নরকতুল্য সংসারে। সেখানে টুকীর পিতার অর্থ আর শেষে টুকীর অভুক্ত যৌবনটির উপর লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে পরিতোষ আর সুন্দরীর। বিয়েতে দেওয়া নগদ টাকাগুলো অনেক অস্ফুট এবং নীরব ধস্তাধস্তির পর সুন্দরী আদায় করে নিয়ে নিজের বাক্সে বন্ধ করেছে। সেই অবসরে টুকীর নির্জনতা আর নিঃসঙ্গতার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক বাড়ীর যে পরিবেশ চিত্রিত করেছেন তা নিছক পাশ্চাত্য 'রিয়ালিজমের

কারি পাউডার' নয়, তাঁর চোখে দেখা জীবনের জলছবি—"... এ বাড়ীর মাটিতে যেন স্ফূর্ত্তি নাই দুস্তর বিস্তীর্ণ একটা আবরণ কোথায় যেন চাপিয়া আছে। ময়লার স্তর একটির পর একটি করিয়া জমিয়া তাহাদের ভিতর দুর্গন্ধ আবদ্ধ হইয়াছিল, সেই দুর্গন্ধ যেন এখন রন্ধ্র পাইয়া অল্পে অল্পে নিঃসৃত হইতেছে, কোথায় অবিরাম একটি সাঁই সাঁই শব্দ উঠিতেছে।"[৪৫]

এমন পুঁতিগন্ধময় পরিবেশে অল্পকাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করার পর টুকীর জীবনের অন্তিম সময় ঘণীভূত হয়েছে একদিন রাতের অন্ধকারে পরিতোষ ও সুন্দরীর আনিত খদ্দের অচিন্ত্যর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দেহদানের সম্ভাবনার মধ্যদিয়ে। টুকীর সব স্বপ্ন, উত্তমের সমস্ত সোনালী স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। টুকীকে শেষ পর্যন্ত সুন্দরীর বাড়ীর চৌকাঠ পার হয়ে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে দাঁড়তে হয়। বৃত্ত সম্পূর্ণ হয় উত্তমের, পুনরায় গণিকা জীবনের ফিরে যাবার ব্যঞ্জনার মধ্যে। এইভাবে গণিকা নারীর সুস্থ গৃহী জীবনে ফেরার বাস্তবচিত্র আর বিশ্বম্ভর পরিতোষ সুন্দরীর নরকতুল্য জীবনের ছবি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের দ্বারা সমালোচিত হয়েছে। এই উপন্যাসটির 'পুস্তক পরিচয়' লিখতে গিয়ে তিনি তৎকালীন 'পরিচয়' পত্রিকায় লিখেছিলেন—"... এই উপন্যাসে যে লোকযাত্রার বর্ণনা আছে আমি একেবারেই তার কিছু জানি নে। সেটা যদি আমারই ত্রুটি হয়, তবু আমি নাচার। বলে রাখছি এদেশে লোকালয়ের যে চৌহদ্দির মধ্যে কাটালুম, এই উপন্যাসের অবলম্বিত সমাজ তার পক্ষে সাত-সমুদ্র পারের বিদেশ বললেই হয়। দূর থেকেও আমার চোখে পড়ে না। লেখক নিজেও হয়তো বা অনতি-পরিচিতের সন্ধানে রাস্তা ছেড়ে কাঁটাবন পেরিয়ে ও-জায়গায় উঁকি মেরে এসেছেন।"[৪৬]

রবীন্দ্রনাথ এরূপ সমালোচনা করার পরেও কিন্তু স্বীকার করেছেন 'তার লঘু-গুরু বইখানা পড়ে দেখলুম। লেখবার ক্ষমতা তাঁর আছে, একথা পূর্বেই জানা ছিল। এবারেও তার পরিচয় পেয়েছি।'[৪৭] 'অনতি পরিচিতের সন্ধানে রাস্তা ছেড়ে কাঁটাবন পেরিয়ে যে লেখককে 'ও জায়গায়' উঁকি মেরে আসতে হয়নি, সেটা লেখকের আত্মপক্ষ সমর্থনের জবাবের মধ্যেই আছে। আসলে ছেলেবেলায় গণিকাদের যেমন প্রতিবেশী হিসেবে দেখেছেন, তাদের আদর-যত্ন-সাহচর্য পেয়েছেন সেই অভিজ্ঞতা তাঁর স্মৃতিতে জাগরুক ছিল। সেই সঙ্গে আদালতে টাইপিস্টের কর্মসূত্রে তিনি যেমন বিচিত্র মানুষকে দেখেছেন, সমাজের যে কদর্য বীভৎস চেহারা প্রত্যক্ষ করেছেন সেই অভিজ্ঞতাও তাঁকে এমন বাস্তবচিত্র বর্ণনায় সহায়তা করেছে। উপরন্তু শান্তিনিকেতনের খুব কাছেই যে বোলপুরের টাউন প্ল্যানিং সে পথ দিয়ে যাতায়াত

কালে 'ও জায়গা' লেখক এমনিতেই দেখেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্টতই 'আসামীর পরিবর্তে' আসামীর জনককে আক্রমণ করার জন্য রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার উত্তরে বলেছিলেন—"লোকালয়ের যে চৌহাদ্দির মধ্যে একতাল আমাকে কাটাইতে হইয়াছে সেখানে 'স্বভাবসিদ্ধ ইতর' এবং 'কোমর বাঁধা শয়তান' নিশ্চয়ই আছে; এবং বোলপুরের টাউন প্ল্যানিং এর দোষে যাতায়াতের সময় উঁকি মারিতে হয় নাই, 'ও জায়গা' আপনি চোখে পড়িয়াছে। কিন্তু তথাপি আমার আপত্তি এই যে, পুস্তকের পরিচয় দিতে বসিয়া লেখকের জীবন কথা না তুলিতেই ভালো হইত; কারণ উহা সমালোচকের 'অবশ্য দায়িত্বের বাইরে' এবং তাহার 'সুস্পষ্ট প্রমাণ' ছিল না।"[৪৮]

এই ভাবে জগদীশ গুপ্ত তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সমাজজীবন সম্পর্কে আপন ভাবনার বৃত্ত ভেঙে বেরিয়ে আসেননি। বরং স্বমহিমায় বিরাজ করেছেন। গ্রাম সমাজের পট-পরিকল্পনায় তিনি জীবনকে একেবারে নগ্ন করে দেখিয়েছেন। যদিও তাঁর পূর্বসূরী শরৎচন্দ্রই প্রথম যথাযথভাবে গ্রাম জীবনকে সাহিত্যে তুলে এনেছিলেন তবু জগদীশবাবুর সঙ্গে তাঁর পূর্বসূরীর সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্র বিরোধিতার পথে গিয়ে 'কল্লোল' গোষ্ঠীর লেখকরা তাঁদের সাহিত্যে যে সমাজ বাস্তবতার পথে পাড়ি দিয়েছেন জগদীশবাবু জ্ঞানতঃ সেই বিরোধিতার পথ মাড়ান নি। বরং কল্লোলীয়দের চেয়ে বয়সে কিছুটা বড় এই মানুষটি নিজের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার নিরীখেই জীবন ও চারপাশকে যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তাতেই তিনি কল্লোলীয়দের থেকে স্বতন্ত্র যেমন হয়েছেন তেমনি নিজস্ব পথরেখাও নির্মাণ করে গেছেন। শরৎচন্দ্র যখন সমস্যার গভীরে ঢুকেছেন তখনও তিনি আবেগের উষ্ণ-অনুরাগের প্রলেপ লাগিয়ে দিয়েছেন সমাজের সব কোণে। সমাজের জাত-পাত ধর্ম-বর্ণ থেকে শুরু করে পতিতা নারীর জীবন সমস্যা—সর্বত্রই শরৎচন্দ্রের হৃদয়ের স্নেহধারা বর্ষিত হয়েছে। এখানেই জগদীশবাবু উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যতিক্রম। এককথায় তাই বলা যায় জগদীশবাবু বাংলাদেশের সমাজের যে চিত্র এঁকেছিলেন তাকে কোনোভাবেই 'ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা' বলা যায় না।

তথ্যসূত্র :

১. উপন্যাসে তমসাবৃত জীবন, ড. সরকার, আবদুল মান্নান , বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১২৬।

২. জীবনানন্দ দাশের কাব্য সংগ্রহ, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), ভারবি, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ১০০।

৩. শরৎ সাহিত্যে সমাজচেতনা, গ্রন্থালয়, প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ২২৪।

৪. বৃহৎ বঙ্গ, প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬, তৃতীয় মুদ্রণ, পৃ. ৫২৪।

৫. ভারত ইতিহাস পরিক্রমা, শ্রীধর প্রকাশনী, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৮, পৃ. ৩৪।

৬. চর্যাগীতি পরিচয়, ড. সত্যব্রত দে, জিজ্ঞাসা এজেন্সিজ, ১৯৯৭ চতুর্থ সংস্করণ, পৃ. ১৮৩।

৭. কবি কঙ্কণ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, ড. সুকুমার সেন (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, পৃ. ৩।

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫।

১৩. বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, স্বপন বসু,পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১৪ পঞ্চম সংস্করণ, পৃ. ৯৫।

১৪. বৈষ্ণব পদাবলী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, চতুর্দশ সংস্করণ, ১৯৯৯, পৃ. ৫৩।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭।

১৬. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৭, পৃ. ৭১।

১৭. দুর্ভিক্ষ, প্রথম গীত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ, সম্পাদনা : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দে বুক স্টোর, ১৯৯৫, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৯১।

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭।

১৯. দুর্ভিক্ষ, দ্বিতীয় গীত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।

২০. বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২।

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

২২. প্যারীচাঁদ রচনাবলী, ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা, পৃ. ১৩০।

২৩. বাংলা উপন্যাসের উন্মেষ পর্ব, সাহিত্য শ্রী পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ১০৭।

২৪. জগদীশ গুপ্তের রচনা ও জগৎ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৭৩।

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১।

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১।

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩।

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬।

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫।

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫।

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫।

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫।

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮।

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২।

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪।

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫।

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০।

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১,

৪১. কথাসাহিত্যিক জগদীশ গুপ্ত, পৃ. ৬০।

৪২. দুষ্প্রাপ্য জগদীশ গুপ্ত - ১, রাজীব চৌধুরী (সম্পাদনা), সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৭।

৪৩. জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১।

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

৪৬. জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ৬৩৭।

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৭।

৪৮. জগদীশ গুপ্তের কথাসাহিত্য : ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের আলোকে, ড. প্রবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়, পরিশিষ্ট অংশ, পৃ. ২৫৪।